প্রকাশ করেছেন
শ্রীরণেন্দ্র কুমার শীল
পর্ণ কুটীর
৬, কামার পাড়া লেন
বরাহনগর।

মুদ্রণ করেছেন
শ্রীগৌরহরি দাস
সরমা প্রেস
২৯, গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

উপন্যাসরূপ
পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদপট-শিল্পী
শ্রীগণেশ বসু

দু'টাকা

এই লেখকের লেখা—

সাগর থেকে ফেরা,

ভাবিকাল, কুয়াশা,

অফুরন্ত, পুতুল ও প্রতিমা,

পঞ্চশর, মৃত্তিকা, মহানগর,

সপ্তপদি, বেনামী বন্দর,

মৌসুমী, ঘনাদার গল্প।

রংপুর ষ্টেশন। প্ল্যাটফর্ম্ম লোকে লোকারণ্য। নিখিলবঙ্গ দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর মনোনীত সভাপতি ডাক্তার রায় আসছেন কলকাতা থেকে, তাই সম্মিলনীর সম্বর্দ্ধনা সমিতির সভাপতি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য কর্ম্মীদের সকলেই এসে জড় হয়েছেন ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে। নানাবিধ পোষ্টার এবং পতাকায় ষ্টেশন প্রাঙ্গণ মেলা-তলার মত রং চংএ হয়ে উঠেছে। পোষ্টারগুলির মধ্যে সকলের আগে চোখ পড়ে প্রকাণ্ড দু-পাটি দাঁত সংযুক্ত পোষ্টারটির ওপর। পতাকাগুলিতেও নানারকম বাণী শোভা পাচ্ছে। সেই সব বিচিত্র বাণীর মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি :

দাঁত তোলালে দাঁতের যন্ত্রণা যাবে না।
দাঁত তোলাও আর বাঁধাও।
দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝ।

দাঁতের গোড়ার রোগ সকল রোগের গোড়া।
আক্কেল দাঁত উঠিলেই আক্কেল হয় না।
মানুষের আদিম অস্ত্র দাঁত।
জয় সভাপতি দন্তবাগীশ ডাক্তার রায়ের জয়।

নিখিলবঙ্গ দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনী, রংপুর।

ট্রেণ আসবার আর বিশেষ দেরী ছিল না আর সেই কারনেই সম্বর্দ্ধনা সমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর অধরনাথ থেকে ভল্যান্টিয়ার পর্য্যন্ত রীতিমত ব্যস্ত এবং উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। অনেকে তো ফুলের মালা পর্য্যন্ত হাতে নিয়ে তৈরী।

রায়বাহাদুর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, চিনতে পারবে তো হে! গুণদাচরণ হেসে বললে, চিনতে পারবো না বলেন কি মশাই। কনফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট তায় আমেরিকা ফেরৎ অত বড় দাঁতের ডাক্তার।

রায়বাহাদুর বললেন, আহা, দাঁতের ডাক্তার বলে তো আর দাঁত দেখে চেনা যাবে না।

গুণদা বললে, না, না, তা কেন। আমাদের বিনোদবাবু তো তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন।

রায়বাহাদুর বললেন, না হে, সেই তো হয়েছে বিপোদ। বিনোদ যে আসতে পারবে না বলে টেলিগ্রাম করেছে—পরের ট্রেণে আসবে জানিয়েছে।

রায়বাহাদুর গলাবন্দ চায়না সিল্কের কোটের পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বার করে গুণদাকে দেখালেন। গুণদার উৎসাহ তবু কমলো না। সে বললে, তাতে আর হয়েছে কি। আমরা না চিনলেও এত বড় মিছিল দেখে তিনি কি আর আমাদের চিনতে পারবেন না?

ট্রেণ আসবার ঘণ্টা পড়ে গেল। চাষী গোছের একটা লোক ভয়ে ছুটতে ছুটতে টিকিট ঘরের সামনে এসে টিকিটবাবুকে বললে, শুনছেন বাবু, তিনটের গাড়ি কটায় ছাড়বে কইতে পারেন।

টিকিটবাবু ঘাবড়ে গেলেন। মিনিটখানেক তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, কি বললে?

লোকটা বললে, আজ্ঞে তিনটের গাড়ি কটার সময়…বলতে বলতেই সে যেন নিজের বোকামীটা বুঝতে পারলো, ফ্যালফ্যাল করে একবার টিকিটবাবুর মুখের দিকে চেয়ে পিছু হাঁটতে হাঁটতে সরে পড়লো। ঠিক তার পিছন দিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় থিয়েটারের ম্যানেজার নকড়িবাবু। কলকাতা থেকে বিখ্যাত গাইয়ে এবং অভিনেতা নটবড় লাহিড়ী আসছেন এই ট্রেণে স্থানীয় থিয়েটারে অভিনয় করতে। নকড়িবাবু তাঁর সহকারী ফ্যালারামকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। হাতে ছিল তার মস্ত একটা পোষ্টার—লাল শালুর উপর তুলো দিয়ে নটবর লাহিড়ীর নাম লেখা। টিকিটঘরের সামনে থেকে পিছু হাঁটতে হাঁটতে লোকটা একেবারে নকড়ির ঘাড়ে এসো পড়লো—পোষ্টারটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

ম্যানেজার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, দেখেছো, দেখেছো ব্যাটার কাণ্ড! কোথায় বিজ্ঞাপনটা পড়বে না উল্টে দিয়ে চলে গেল।

পোষ্টারটা তুলতে তুলতে ফ্যালারামকে বললেন, খুব বিজ্ঞাপন দিয়েছি কি বলো ফ্যালারামবাবু? বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কন্দর্পকান্তি, কিন্নরকণ্ঠ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট নটবর লাহিড়ী আপনাদের মাঝখানে···

ফ্যালারাম বললে, আজ্ঞে ওটা মাঝখানে নয়, সামনে হবে। থিয়েটার তো আর যাত্রা নয়।

ম্যানেজার চটে উঠলেন: ছাখ ফ্যালা, বিশবছর থিয়েটার চালাচ্ছি, তুই এসেছিস আমায় বিজ্ঞাপন লেখাতে? আমার খুশী আমি মাঝখানে লিখবো। আমি যদি সামনের বদলে পিছনে লিখি কি করতে পারিস তুই?

ফ্যালারাম বললে, পেছনে কেন আপনি ল্যাজে লাগান, আমার বাকী ছ-বছরের মাইনে চুকিয়ে দিন, থিয়েটারে কাজ আমি করতে চাই না।

ম্যানেজার স্বর নরম করে বললেন, আহা চটিস কেন, চটিস কেন! এবারটা যা হয়ে গেছে যাক, আসছে বারে ঠিক সামনে লাগিয়ে দেব দেখিস। কিন্তু ব্যাপার কি বল্ দেখি। গোটা প্ল্যাটফর্ম্মটাই যে দন্ত বিকাশ করে হাসছে····

ফ্যালারাম সগর্ব্বে জবাব দিলে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! অত বড় অভিনেতা আসছেন···

দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সম্বর্দ্ধনা সমিতির একজন সদস্য একটি পতাকা হাতে নিয়ে এই দিকে আসছিলেন, ফ্যালারামের কথাটা তাঁর কানে গেল। তিনি বললেন, অভিনেতা আবার কে? ডেন্টিষ্ট কন্‌ফারেন্সের সভাপতি ডাক্তার রায় আসছেন।

ম্যানেজার তার কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে ব্যঙ্গ কণ্ঠে বললেন, আসছেন নাকি! তাই বুঝি ষ্টেশনে এমন দাঁত কপাটি লেগেছে! কিন্তু তিনি তো আর গোটা ট্রেণটা কামড়ে আসছেন না, ট্রেণে অন্য

হুচারজন লোকও আছে। নটবর লাহিড়ীর নাম শুনেছেন—বিখ্যাত গাহিয়ে ও অভিনেতা। তিনিও আসছেন এই ট্রেণে আমাদের থিয়েটারে অভিনয় করতে, বুঝলেন ?

যাঁকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা হলো তিনি বুঝলেন কি না বলা শক্ত, তবে আর বাক্যব্যয় না করে সেখান থেকে সরে গেলেন।

চলন্ত ট্রেণের কামরায় ডাক্তার রায় এবং তাঁর সহকারী গোবিন্দকে দেখা গেল। রংপুর আসতে আর দেরী নেই, কাজেই দুজনে সুটকেশ এবং বিছানা গুছোতে ব্যস্ত। ডাক্তার রায় এ-সব ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি, সুটকেশ গুছোতে গিয়ে যতই অগোছাল করে ফেলছেন এবং ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠছেন ততই তিনি অপ্রসন্ন হয়ে উঠছেন গোবিন্দর উপর। অবশেষে তিনি হতাশ হয়ে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে বললেন, তুমি একটি হাঁদা গোবিন্দ। সব ছড়িয়ে পড়ে রইলো, এদিকে ষ্টেশন এসে গেল।

গোবিন্দ বললে, আজ্ঞে না স্যার এখনও ডিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যাল পার হয় নি, দেরী আছে।

—দেরী আছে! দেরী আছে! তোমার ওই এক কথা। তারপর ষ্টেশন এসে পড়ুক, তখন নামবার সময় পাওয়া যাবে না। নাও তাড়াতাড়ি নাও, কাজের সময় কথা আমি পছন্দ করি না।

ডাক্তার রায় উত্তেজিত ভাবে কোটের বোতাম আঁটতে লাগলেন, গোবিন্দ আবার সুটকেশের দিকে মন দিল। বোতাম আঁটা শেষ করে ডাক্তার রায় চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এই বারই রংপুর ষ্টেশন আসবে ঠিক জানতো ?

—না এসে যাবে কোথায় স্যার, পালিয়ে তো আর যাবে না।

—আহা তাই বলছি নাকি। কিন্তু ধরো যদি ষ্টেশনে কেউ না আসে ?

—বলেন কি স্যার! নিখিলবঙ্গ দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সভাপতিকে অভ্যর্থনা করতে কেউ থাকবে না তা কি হ'তে পারে?

—ষ্টেশনে তা হ'লে নিশ্চয় লোক থাকবে কি বলো? কিন্তু ধরো যদি আমাদের চিনতে না পারে?

এ-কথাটা অবশ্য গোবিন্দর এর আগে মনেও হয় নি। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো।

ডাক্তার রায় বললেন, ওই তোমার বড় দোষ গোবিন্দ! কাজ সারবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাববে!

গোবিন্দ আবার সুট্‌কেশের দিকে মন দিল।

এই ট্রেনেরই আর একটি কম্পার্টমেন্ট।

ফকির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছিল, তার হাতের খবরের কাজখানা হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটায় তার মুখ ঢেকে ফেললো।

সুজিত জিজ্ঞাসা করলে, কিহে ফকির চাঁদ, কি দেখছো? রংপুর আসতে আর কত বাকী?

ফকির জবাব দিলে: দেখতে দেখতে চাপা পড়ে গেল যে।

—চাপা পড়ে গেল! সে কি হে? চেন্ টানবো না কি?

—না, না, চাপা কেউ পড়েনি, ওই কাগজটা। বলেই জানালা দিয়ে আর একবার মুখ বার করে বললে, নাও তৈরী হয়ে নাও, রংপুর এসে পড়লো।

সুজিতের কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা গেল না। সে ধীরে সুস্থে সুটকেসটা বন্ধ করতে করতে আবৃতির সুরে আওড়াতে লাগল:

এবার তবে খুঁজে দেখি
অকূলেতে কূল মেলে কি
দ্বীপ আছে কি ভব সাগরে···

ফকির বললে, তোমার ও সব হেঁয়ালী আমার ভাল লাগে না। শুধু বখেয়া সেলাই নিয়ে এমন বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়িয়ে কি হবে?

সুজিত তেমনি নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, তুমি বুঝতে পারছো না ফকিরচাঁদ, বঙ্গীয় বেকার-সঙ্গের অবৈতনিক সেক্রেটারীর একটা কর্ত্তব্য আছে তো!

—রেখে দাও তোমার বেকার-সঙ্ঘ আর তার কর্ত্তব্য! ফকির বললে একটু ঝাঁঝালো স্বরে: বেকার-সঙ্ঘের সেক্রেটারী হয়ে এত ঘোরাঘুরি করেও তো একটা কাজ জোটাতে পারলে না।

সুজিত তাতেও দমলো না, বললে, আরে কাজ জুটলেই তো সাকার হয়ে যাব, তখন তো আর বেকার থাকবো না। তার আগে বেকার যুবকদের তরফ থেকে সমস্ত শহর জরীপ করে বেড়াচ্ছি··· কোথায় কাজের কি ভরসা হঠাৎ মিলে যেতে পারে কে জানে!

ট্রেণ এসে থামতেই চারিদিকে যেন হুড়োহুড়ি সুরু হয়ে গেল। যারা মালা নিয়ে অপেক্ষা করছিল তাদের মধ্যে সুরু হোলো কে আগে ডাক্তার রায়ের কাছে পৌঁছবে তারি প্রতিযোগিতা। চারিদিকের ছুটাছুটি, ঠেলাঠেলির মধ্যে রায় বাহাদুরের গলা শোনা গেল: কই হে, তাঁকে দেখতে পাচ্ছ?

সুজিত আর ফ্যালারাম তাদের কম্পার্টমেণ্ট থেকে নামবার উপক্রম করছিল, কে একজন সুজিতকে দেখিয়ে বললে, আজ্ঞে ওই যে—ওই সেকেণ্ড-ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট—ওই তো দাঁড়িয়ে আছেন, চেহারা আর পোষাক দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে···

ব্যস, আর যায় কোথায়? সবাই ছুটলো সেই সেকেণ্ড-ক্লাস কামরার দিকে। সমবেত কণ্ঠে অভ্যর্থনা সুরু হয়ে গেল: আসুন, আসুন, নেবে আসুন।

সুজিত এবং ফকির দুজনেই রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুজিত নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, নামবার জন্যে ব্যাকুল হয়েই আছি, কিন্তু আপনারা···

অভ্যর্থনা সমিতির একজন প্রবীন সদস্য এগিয়ে এসে বললেন, আমরা আপনার অভ্যর্থনার জন্যেই এখানে সমবেত হয়েছি। ইনি রায়বাহাদুর অধরনাথ, রিসেপসান কমিটির চেয়ারম্যান।

রায়বাহাদুরকে দেখিয়ে দিয়ে তিনি হাঁকলেন, কই হে, মালা কোথায়? মালা হাতে করে কয়েকজন শুজিতের সামনে এসে দাঁড়াল। রায়বাহাদুর এবং আরও কয়েকজন মিলে সেগুলি সুজিতের গলায় পরিয়ে দিলেন। ফকির কি বলবে, কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না, এক একবার ভাবছিল, লাফ দিয়ে প্লাটফর্মে পড়ে চোঁচা দৌড় দেয়, কিন্তু তার আগেই কে একজন একগাছি মালা নিয়ে তার সামনে এসে বললে, আপনাকেও পরতে হ'বে।

ফকিরের কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়তে লাগলো। নিশ্চয়ই এদের কোথাও ভুল হয়েছে, নইলে তাকে···

সুজিতের দিকে চাইতেই সুজিত তাকে মালাটা পরবার জন্যে চোখে চোখে ইশারা করলে, ফলে ফকিরচাঁদ বিনা প্রতিবাদেই মালা পরে ফেললো।

সভাপতির আগমন উপলক্ষে স্থানীয় হাইস্কুলের পণ্ডিত মশাইকে দিয়ে যে গান লেখান হয়েছিল ছেলের দল এইবার সমবেতকণ্ঠে সেটা গাইতে শুরু করে দিল।

ফকিরচাঁদের মনে হোলো তার কাণের কাছে কতকগুলো বোমা ফাটছে।

সুজিত ট্রেণ থেকে নামতেই রায়বাহাদুর বললেন, কলকাতা থেকে আসতে খুব বেশী কষ্ট হয়নি তো?

সুজিত নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিলে : না, কষ্ট আর কি! শুধু যা টিকিট কেনবার···

—টিকিট কেনবার কষ্ট! রায়বাহাদুর ক্ষুব্ধ, ক্ষুব্ধভাবে বলে উঠলেন, আহাম্মুকরা আপনাদের দিয়ে টিকিট কিনিয়েছে! কি অন্যায়!

—অন্যায় বই কি! আমাদের দিয়ে টিকিট কেনান অত্যন্ত অন্যায়! সুজিত তেমনি নিস্পৃহভাবে বলে উঠলো।

রায়বাহাতুর বললেন, ছি, ছি, কি লজ্জার কথা!

সুজিত বললে, যাক আর লজ্জিত হবেন না। যা হবার তা হয়ে গেছে। ব্যাপার কি জানেন, পারতপক্ষে আমরা টিকিট কিনি না।

রায়বাহাতুর বললেন, ঠিক কথাই তো! আপনারা টিকিট কিনবেন কি!

সুজিত ফকিরের দিকে চাইলে, তারপর বললে, আমিও ঠিক এই কথাই রেলকোম্পানী আর ফকিরচাঁদকে বোঝাতে চাই।

ফকিরকে দেখিয়ে সুজিক অমায়িকভাবে বললে, এঁরই নাম ফকিরচাঁদ, আমার সহকারী···

রায়বাহাতুর বললেন, বেশ, বেশ, আলাপ করে সুখী হলাম।

সুজিত হাসতে হাসতে বললে, পরে আরও হবেন।

এদিকে থিয়েটারের ম্যানেজার নকড়িবাবু সহকারী ফ্যালারামকে নিয়ে নটবর লাহিড়ীর সন্ধানে প্লাটফর্মের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কলকাতার সেই বিখ্যাত গাইয়ে এবং অভিনেতাকে কোথাও আবিষ্কার করতে না পেরে তিনি ফ্যালারামের দিকে চেয়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন, কি হে, হোলো কি! কোন পাত্তাই তো নেই। না আসবার কারণও তো কিছু বুঝতে পারছি না। রওনাই হয় নি নাকি?

ফ্যালারাম চুপ করে একটু ভাবলে, তারপর বললে, রওনা হয়তো ঠিক হয়েছিলেন, কিন্তু মাঝপথে গাড়ী বদলেছেন।

—গাড়ী বদলেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, গাড়ী ছেড়ে হয়ত বোতল ধরেছেন।

ম্যানেজার এতটা বিশ্বাস করতে পারলেন না, বললেন, তোর যেমন কথা। দাঁড়া, আর একবার প্ল্যাটফর্মটা ভাল করে খুঁজে দেখি···

তিনি আবার নটবর লাহিড়ীর খোঁজে চললেন।

প্লাটফর্মের আর একপ্রান্তে ডাক্তার রায় তাঁর বিছানা এবং সুটকেস নিয়ে নেমে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তাড়াতাড়ি নামবার সময় তিনি বিছানাপত্র এমন ভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলেছিলেন যে সেগুলোর মাঝখানে তাঁকে প্রায় ছোট ছেলের মতো অসহায় মনে হচ্ছিল। গোবিন্দ বাকী কটা জিনিস নিয়ে ট্রেণ থেকে নামতেই ডাক্তার রায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে, আর কিছু গাড়ীতে নেই তো?

গোবিন্দ সবিনয়ে বললে, শুধু গদিগুলো আছে স্যার।

—আহা, গদিগুলো কি তোমায় আনতে বলেছি? কিন্তু এদিকে যে কারও দেখা নেই। তোমাকে তখনই বলেছিলাম কাজ নেই এমন বেপো· জায়গায় এসে। এদের কি আর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, হয়তো ভুলেই গেছে লোক পাঠাতে।

নকড়ি ফ্যালারামকে নিয়ে এইদিকে আসছিলেন; ডাক্তার রায়ের কথার শেষটুকু তাঁর সজাগ কাণকে ফাঁকি দিতে পারলো না; নকড়ি এগিয়ে এসে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাক্তার রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কার জন্যে অপেক্ষা করছেন? নিশ্চয় আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন?

ডাক্তার রায় বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

নকড়ি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন: তা বলতে হয়। আমরা এতক্ষণ গরু খোঁজা করে বেড়াচ্ছি। চলুন, চলুন। আপনাদের জন্যে ভেবে এতক্ষণ সারা হচ্ছিলাম। নাও না হে ফ্যালারাম, জিনিষপত্র তোলো, গাড়ি ডাকো।

ফ্যালারামের কোথায় যেন খট্‌কা লাগছিল, সে একটা ঢোক গিলে বললে, দাঁড়ান, আগে পরিচয়টা নিন।

ম্যানেজার বললেন; পরিচয়! কিসের পরিচয়! মুখ দেখে লোক চিনিস না? বিশ বছর থিয়েটারের ম্যানেজারী করছি, হ্যাঁ করলেই গুণী লোক চিনতে পারি। নাও, জিনিষপত্র তোলো—নকড়ির আগ্রহের তোড়ে ফ্যালারামের আপত্তি খড়ের কুটোর মতো ভেসে গেল। মোটামুটি ব্যাপার দাঁড়াল এই: নিখিলবঙ্গ-দন্ত-চিকিৎসক সম্মিলনীর সম্বর্দ্ধনা সমিতির উৎসাহী সদস্যরা ডাক্তার রায় মনে করে বেকার সঙ্ঘের অবৈতনিক সম্পাদক সুজিতকে নিয়ে চললো শোভাযাত্রা সহকারে এবং রংপুর পুর্ণিমা থিয়েটারের প্রবীণ ম্যানেজার নকড়ি ডাক্তার রায়কে নটবর লাহিড়ী মনে করে ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে চললেন তাঁর বিখ্যাত থিয়েটারের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু সত্যি যিনি নটবর লাহিড়ী—সেই স্বনামধন্য অভিনেতা ও গায়ক, তিনি কোথায়?

ট্রেণ রংপুর ষ্টেশন ছাড়তেই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় সঙ্গোপাঙ্গ পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁকে দেখা গেল। শুধু দেখা গেল বললে সবটুকু বলা হয় না, বলতে হয় দর্শন লাভ করা গেল। চারিদিকে মদের বোতল, কাচের গ্লাস সিগারেটের টুকরো, পানের পিচ··· তারই মধ্যে বসে নটবর লাহিড়ী, হাতে একটি বোতল। বোতলে তরল পদার্থের আর এক বিন্দুও অবশিষ্ট নেই, সেইটিকেই তার গ্লাসের ওপর উপুর করে ধরে আছে। বহুক্ষণ ধরে বহু প্রকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যখন এক ফোঁটাও পড়লো না, নটবর তখন বললে, কই পড়ছে না কেন বাবা!

বন্ধুদের মধ্যে একজনের তখনও একটু হুস ছিল, সে বললে, থাকলে তো পড়বে, বোতল যে একেবারে খালি। নটবর চটে উঠলো: খালি কি রকম। এই তো খানিক আগে ভর্ত্তি ছিল। তা হ'লে বার করো আর এক বোতল।

বন্ধুটি বললে, না, না, নটবর আর খেয়ো না, শেষে মাইরি ষ্টেশন চিনে নামতে পারবো না। রংপুরে নটবর লাহিড়ীর অভাবে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

অতদূর ভাববার অবস্থা নটবরের ছিল না, সে বললে, আপাততঃ বোতল বার না করলে আমি নিজেই কেলেঙ্কারী করবো।

অগত্যা বন্ধুটি টলতে টলতে উঠে বাক্স খুলে আর একটি বোতল বার করে নটবরের কাছে নিয়ে এলো।

রংপুর ষ্টেশন যে পার হয়ে গেছে সে কথা নটবরও জানলো না, তার বন্ধুরাও না।

সুজিতকে নিয়ে শোভাযাত্রা চলেছিল শহরের রাস্তা দিয়ে। মোটরের পিছনদিকের সীটে রায়বাহাদুর অধীরনাথ, সুজিত এবং গুণদাচরণ। ফকির এবং ড্রাইভার সামনের দিকে। যেতে যেতে গুণদাচরণ সুজিতকে বললেন, দেখুন, আপনি সত্যি দয়া করে এই এতদূর আসবেন আমরা ভাবতে পারিনি।

সুজিত বললে : আমিও ঠিক পারিনি, তবু কি রকম এসে পড়লাম।

গুণদাচরণ বললেন : আমরা সেজন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কি করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব ভেবে পাচ্ছি না।

সুজিত একটা ঢোক গিলে বললে, আমিও একটু ভাবনায় পড়েছি, আচ্ছা, আপনাদের কোন রকম ভুলটুল···

—ভুল? বলেন কি? সুজিতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, এর চেয়ে ভাল নির্ব্বাচন আর কি হতে পারে? বাংলাদেশের দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীতে সভাপতি হবার পক্ষে আপনার চেয়ে যোগ্য লোক আর কে আছে?

সুজিত একটা নিঃশ্বাস লুকিয়ে ফেলে বললে, শুনে সুখী হলাম। ছেলেবেলা থেকে দাঁতের কদরটা ভাল করেই বুঝেছি, এক রকক

দাঁতের জোরেই দুনিয়ায় টিকে আছি বলতে পারেন। কিন্তু পুরস্কারটা বোধ হয় একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে ; সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করাটা কি উচিত হবে—তার চেয়ে বেকার সমস্যা সম্বন্ধে···

গুণদাচরণ বললেন, আজ্ঞে আপনি সভাপতি, আপনাকে আমরা কি বলবো। অভিভাষণে আপনি যে বিষয়ে ইচ্ছা বলবেন। তা ছাড়া বেকার সমস্যাই বলুন আর যাই বলুন, সব সমস্যার মূলে ওই দাঁত।

—নিশ্চয়। কিন্তু আপাততঃ কোথায় চলেছি বলুন তো ?

—আমাদের চেয়ারম্যান রায়বাহাদুরের বাড়ীতে। সেখানেই আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আগেই তো আপনাকে একথা জানান হয়েছিল···

সুজিত এবার একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলো। অত্যন্ত অপ্রতিভ, ডানপিটে ছেলে, জীবনে কোন অবস্থায় হার স্বীকার করতে নারাজ, কিন্তু এখন মোটরের খোলা হাওয়াতেও কপালে ঘাম দেখা দিল। রংপুরে থাকবার জায়গা নেই, তাই এদের ভুলের সুযোগ নিতে সে দ্বিধা করেনি, কিন্তু তাই বলে একেবারে রায়বাহাদুরের বাড়ীতে—

সুজিত একটা ঢোক গিলে বললে : কিন্তু···

রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে বললেন, আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

সুজিত বললে, না, তা হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এতটা সুবিধে আমরা আশাই করি নি। কি বল হে ফকির চাঁদ ?

ফকির চমকে উঠে বললে : কি বলবো বুঝতে পারছি না···

নটবর লাহিড়ীর আগমন উপলক্ষে পূর্ণিমা থিয়েটারের বাড়ীটি আমপাতা এবং ফুল দিয়ে যথারীতি সাজান হয়েছিল এবং বাড়ীর দেওয়ালে ও তার আশেপাশে এমন এতটুকু জায়গা ছিল না যেখানে

কলকাতার বিখ্যাত অভিনেতায় আগমনসূচক বিজ্ঞাপন বা প্লাকার্ড পড়ে নি। স্কুল কলেজের ছেলেরা তো সকাল থেকেই থিয়েটার বাড়ীর আশেপাশে ঘোরাফেরা সুরু করে দিয়েছিল। ম্যানেজার নকড়ি ডাক্তার রায়কে নিয়ে যখন পূর্ণিমা থিয়েটারের সামনে পৌঁছলেন তখন সেখানে রীতিমত একটি ভিড় জমে গেছে— কলকাতার য়্যাক্টর, তাকে একেবারে সামনা সামনি দেখা, সে কি কম সৌভাগ্য! ম্যানেজার সেই কৌতূহলী জনতার মাঝখান দিয়ে ডাক্তার রায় এবং গোবিন্দকে নিয়ে সগর্ব্ব-পদ ফেলে ভিতরে ঢুকে গেলেন। ফ্যালারামও যেতে যেতে কৃপামিশ্রিত দৃটিতে সকলের দিকে চাইতে ভুললো না।

থিয়েটারের ভিতরে ষ্টেজের উপর কয়েকটি মেয়ে নাচের মহলা দিচ্ছিল। নকড়ি প্রভৃতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নাচ বন্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু একটু সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন, তিনি বিব্রত ভাবে ম্যানেজারকে বললেন, দেখুন, এটা থিয়েটার বলে মনে হচ্ছে না?

নকড়ি অমায়িকভাবে উত্তর দিলেনঃ আজ্ঞে হ্যাঁ, এই তো আমাদের বিখ্যাত পূর্ণিমা থিয়েটার। এইখানেই আপনাদের থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। কোন অসুবিধে হবে না। অভিনয়ের পর কোথাও যাবার পর্য্যন্ত দরকার হবে না।

ডাক্তার রায়ের মনের খটকা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছিল, তিনি অসহায়ভাবে গোবিন্দর দিকে চাইলেন, গোবিন্দ চেয়ে রইলো তাঁর দিকে।

ডাক্তার রায় বললেন, কিন্তু আমরা যে শুনেছিলাম স্বয়ং চেয়ারম্যান···

নকড়ি ডাক্তারের কথাটা শেষ করতে দিলেন না, বললেন, বাইরে ওরকম কত কথা শুনবেন মশাই। চেয়ারম্যান—চেয়ারম্যান আবার কে মশাই? যা কিছু তা এই শর্ম্মা, ম্যানেজার বলতে ম্যানেজার, প্রোপ্রাইটার বলতে প্রোপ্রাইটার, পম্‌টার বলতে পম্‌টার। আপনি ও-সব কারও কথায় কাণ দেবেন না, শুধু আমাকে চিনে রাখুন।

ফ্যালারাম কাসতে কাসতে চুপ। এগিয়ে এসে বললে : আর, এই ফ্যালারামকে। তা ছাড়া আর সবাই জানবেন ভাঙচি দেবার তালে…

ডাক্তার নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি, দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সঙ্গে পূর্ণিমা থিয়েটারের যোগসূত্রটাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না, একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, কিন্তু থিয়েটারের ভেতর থাকাটা—

কেন তাতে দোষ কি মশাই? নকড়ি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

জবাব দিলে গোবিন্দ : না, না, তা নয়, তবে যদি কোন বদনাম টদনাম হয় সেই ভয় কি না…

ফ্যালারাম মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে বললে : হুঃ, ব্যাঙের আবার সর্দ্দি!

গোবিন্দ কথাটার মাহাত্ম বুঝতে না পেরে ডাক্তার রায়ের মুখের দিকে চাইলো।

নকড়ি বললে, না না, ও সব কথা ভাববেন না, আসুন আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই। তারপর একটু বিশ্রাম করে, মানে একটু চা টা খেয়ে গানের রিহার্স্যালে বসা যাবে কি বলেন?

গান! বলে কি লোকটা? ডাক্তার রায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, কই গানের কথাতো ছিল না! আমি শুধু—

গানের কথা ছিল না! নকড়ির গলার স্বর চড়ে গেল : আমায় পথে বসাবেন না কি? গান গাইবেন না তো আপনাকে এতগুলো টাকা দিয়ে আনলাম কি জন্যে?

ডাক্তার রায়ের মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগলো। প্রথমটা ভাবলেন, তামাসা। নকড়ির মুখের দিকে চেয়ে মত বদলাতে হোলো। কিন্তু…দন্ত চিকিৎসক সম্মিলনীর সভাপতিকে গান গাইতে হবে, তাও আবার রিহার্স্যাল দিয়ে! আমেরিকার মত প্রগতিশীল দেশেও কেউ এতটা কল্পনা করেছে কি না…

ডাক্তার বললেন, আপনি ভুল করেছেন, আমি দাঁতের—

—দাঁতের ব্যথা হয়েছে? ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছি। তাতে

গানের অসুবিধা কি? ও সব বাজে কথা রাখুন মশাই, ব্যগ্রতা করছি, দোহাই আপনার, আপনারা আমায় এমন করে ডোবাবেন না। পূর্ণিমা থিয়েটার অমাবস্যা হয়ে যাবে।

—কিন্তু দাঁতের...

—ওষুধ যা চান এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি—চানতো দাঁতও তুলিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু দোহাই আপনার, গান আপনাকে গাইতেই হ'বে...

ডাক্তার রায়কে কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে নকড়ি তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন।

রায়বাহাদুর সুজিত এবং ফকিরকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। প্রকাণ্ড বাড়ী, পুরোদস্তুর হাল ভ্যাসানে সাজান এবং গোছান। ফকির দু'হাতে দুটো সুটকেশ নিয়ে নেমে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো, ভিতরে যাবার সময় হোঁচটও খেলে দু'চার বার। সুজিতও কম বিব্রত বোধ করছিল না, কিন্তু যে কোন অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেবার একটু ক্ষমতা ছিল বলে বাইরে থেকে তার অস্বস্তির ভাবটা মোটেই বোঝবার উপায় ছিল না।

তারা রায়বাহাদুরের পিছনে পিছনে হল ঘরটায় ঢুকতেই দুদিক থেকে দুজন চাকর এসে ফরিরের হাত থেকে সুটকেশ দুটি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফকির আপত্তি জানাবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুজিতের দিকে চোখ পড়তেই তাকে সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হ'তে হোলো।

ঘরের মধ্যে রাজলক্ষ্মী এবং রমা বসেছিল। রায়বাহাদুর পরিচয় করিয়ে দিলেন : ইনি আমার বোন আর এটি আমার ভাগ্নী রমা। ইনিই ডাক্তার রায়, এর কথা তো সবই শুনেছ। আর ইনি হ'লেন ডাক্তারবাবুর এসিষ্টাণ্ট ফকিরবাবু।

সুজিত আর ফকির ওদের নমস্কার জানাল।

রায়বাহাদুর বললেন, মঞ্জু কোথায় গেল? মঞ্জু আর মায়াকে

তো দেখছিনা। রমা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সিঁড়িতে কাদের ছুটোছুটি এবং খিল্ খিল্ হাসির শব্দ পাওয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই মায়ার পিছনে পিছনে ট্রাউজার পরা একটি তরুণী ছুটতে ছুটতে নেমে এলো।

মায়া রায়বাহাদুরের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, বাবা দেখনা—ট্রাউজার পরা মেয়েটি মঞ্জু। তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মায়া রায়বাহাদুরের চারিদিকে ঘুরতে লাগলো এবং ঘুরতে ঘুরতেই বললে, বাবা দেখনা, দিদি আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে…

মঞ্জু বললে ঃ বারে! তুমি আমার টেনিস র‍্যাকেট লুকিয়ে রেখেছিলে কেন ?

মায়া বললে ঃ বাঃ। আমি তো কবে বার করে দিয়েছি।

মঞ্জুর এই রকম ধিঙ্গীপনা রমার ভাল লাগে না। সে বলে উঠলো ঃ আঃ মঞ্জুদি! কি অসভ্যতা হচ্ছে। দেখছ না কারা এসেছেন ?

মঞ্জু এতক্ষণে সুজিতের দিকে চাইলো; সে চাওয়ার মধ্যে দেখার চেয়ে তাচ্ছিল্যের ভাবটাই বেশী। পরক্ষণেই মুখ ফিরিয়ে বললে ঃ ওঃ! I am sorry.

রায়বাহাদুর এতক্ষণ প্রসন্নমুখে বড় আর ছোট মেয়ের দৌরাত্ম উপভোগ করছিলেন, এবার সুজিতের দিকে চেয়ে বললেন ঃ এটি আমার বড় মেয়ে মঞ্জু আর এটি আমার ছোট মেয়ে মায়া।

সুজিত তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার জানাল মঞ্জুকে। মায়া এই ফাঁকে নিয়মরক্ষা হিসাবে একটা প্রতিনমস্কার জানাল। মায়া এই ফাঁকে সরে পড়বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেটুকু মঞ্জুর দৃষ্টি এড়াল না, সে তখনই তার পিছু নিল। তারপর দুজনেই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল, দূর থেকে শোনা গেলো তাদের খিল খিল হাসির শব্দ।

রায়বাহাদুর একটু কুণ্ঠিতভবে বললেন, মা-মরা মেয়ে, একটু বেশী দুরন্ত আর খামখেয়ালী। কিছু মনে করবেন না ডাক্তার রায়।

রাজলক্ষ্মী বললেন, মনে নিশ্চয় করছেন। এত বড় মেয়ের

একটা জ্ঞানগম্যি নেই, তোমার বেশী প্রশ্রয় পেয়েই তো এই রকম হয়েছে।

রায়বাহাদুর সুজিতের দিকে চেয়ে বললেন, দেখুন, প্রশ্রয় আমি ঠিক দিই না। তবে কি জানেন···

সুজিত বললে, আপনি লজ্জিত হবেন না রায়বাহাদুর। ছেলেরা তো চিরদিন প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে, এখন মেয়েদের একটু প্রশ্রয় দিয়ে দেখলে ক্ষতি কি!

সুজিতের কথায় সবাই হেসে উঠলো।

রায়বাহাদুর বললেন, চলুন, চলুন, ভিতরে চলুন। এতটা পথ ট্রেণে এসে নিশ্চয় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, বিশ্রাম করে একটু সুস্থ হয়ে নিন।

দোতলায় রমার ঘর। ড্রেসিং টেবিলের সামনে রমা ঠোঁটে লিপষ্টিক ঘষছিল।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকে বললেন, আহা দিব্যি ছেলেটি! অত বড় ডাক্তার কে বলবে! দেমাক নেই, কেবল হাসি খুশী।

রমা বললে, এরি মধ্যে তোমার মায়া পড়ে গেল মা?

—তা পড়েছে বইকি একটু! অমনি একটি জামাই যদি পেতাম। রাজলক্ষ্মী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। রমার মুখে মুহূর্ত্তের জন্যে বুঝি লজ্জার আভা লাগলো, তারপরই সে লিপষ্টিকটা নামিয়ে রেখে বললে: ওসব আশা করোনা মা। মামাবাবু মনে মনে কি এঁচে রেখেছেন জানতো? মঞ্জুর সঙ্গে ডাক্তার রায়ের বিয়ের কথাটা এইবার পাকা করে ফেলবেন। রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করে বললেন, হ্যাঁ, ডাক্তারের তো আর দায় পড়েনি ওই ধিঙ্গী মেয়েকে বিয়ে করবে। কেন, ভাল মেয়ে কি আর নেই! চোখ থাকে তো দেখতে পাবে।

—চোখ কি সকলের থাকে!

বলে রমা লিপষ্টিকটা আবার তুলে নিয়ে আয়নায় মুখ দেখতে লাগলো।

রাজলক্ষ্মী বললেন, চোখ যদি না থাকে, ফুটিয়ে দিতে হয়।

রায়বাহাদুরের বাড়ীতে দোতলায় সুজিত এবং ফকিরের জন্যে যে ঘরটি নির্দিষ্ট হয়েছিল, দেখা গেল ফকির তার দরজাটি সন্তর্পণে বন্ধ করে দিয়ে সুজিতের কাছে এগিয়ে এলো। সুজিত একটা শোফা দখল করে বসলো এবং একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, কোথায় উঠবে ভেবে অস্থির হচ্ছিলে ফকিরচাঁদ, এখন খুশী হয়েছ?

ফকির বললে, হ্যাঁ, এখন শুধু হাজতে গিয়ে উঠলেই নিশ্চিন্ত হই।

সুজিত হাসতে হাসতে বললে, তুমি ভড়কে গেলে ফকিরচাঁদ?

—ভড়কাব না, কি কাজটি করে বসেছ ভাব দেখি!

—আহা, আমি কি করলাম হে। সবই তো লীলাময়ের ইচ্ছা।

—তোমার ঠাট্টা ইয়ার্কি আমার ভাল লাগছে না, এখন কি করবে বলো দেখি?

—সেটা ঠিক বলতে পারছি না, তবে যে স্বনামধন্য ডাক্তার রায় নই, নেহাৎ সুজিত চক্রবর্ত্তী, বেকার সঙ্ঘের কপর্দ্দকহীন অবৈতনিক সেক্রেটারী এটা জানতে পারলে এরা বোধ হয় খুশী হবেন না।

—শুধু খুশী হবেন না? ধরে পুলিশে দেবেন।

সুজিত নির্ব্বিকার ভাবে বললে, সে অবস্থায় এরকম একটা সদিচ্ছা এদের মনে উদয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

—তবু তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো? ফকির উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেঃ আমার যে ভয়ে হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

—না, না, সেটা হ'তে দিও না। হাত পা গুলোর এখন হঠাৎ বিশেষ প্রয়োজন হ'তে পারে। তুমি একবার চট করে বাইরেটা দেখে এসো, অতিথি সৎকারের জন্য বাইরে এদের কেউ ওৎ পেতে বসে আছে কি না।

ফকিরের মুখ আরও শুকিয়ে গেল; সে প্রায় কাঁদ কাঁদ ভাবে বললে, ও বাবা! তা হলেই তো গেছি—তাও থাকতে পরেন না কি।

—কিছু বিশ্বাস নেই, এঁদের অতিথি বাৎসল্য যে রকম গভীর! নাও, তুমি চট করে ঘুরে এসো—

ফকির নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুজিত শোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে ভাবতে লাগলো সমস্ত ব্যাপারটা। জীবনে তুঃসাহসিক কাজ সে কম করেনি, অবশ্য এবারের কাণ্ডটা একটু বেশী ঘোরাল, তা হ'লেও...

ফকির তখনই ফিরে এলো।

সুজিত বললে, কি হোলো?

—আছে।

—কে আছে?

—আছে বলছি।

—কে আছে ছাই বল না।

—কুকুর।

সুজিত হেসে উঠলো: তাই ভালো। কোন লোক টোক নেই তো?

—না, আর কেউ কোথাও নেই। এই বেলা সরে পড়তে হবে।

—একটু ভেবে দেখলে হ'তো না?

—আবার কি ভেবে দেখবে?

—বিশেষ কিছু না। এদের একেবারে হতাশ না করে এ বেলার মত আহারটা এখানেই শেষ করে গেলে হ'তো না? এদের আতিথ্যের একটা সম্মান রাখা উচিত।

ফকিরের আর এক মুহূর্ত্তও এ-বাড়ীতে থাকবার ইচ্ছা বা সাহস ছিল না, সে বললে তা হলে তুমি সম্মান রাখ, আমি চললাম।

সুজিত বললে, তা হ'লে আমার আর থাকা চলে কি করে! বাড়ীটার উপর আমার কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল সেইজন্যেই···তা যাক গে, চল।

সুজিতের করুণ কণ্ঠ ফকিরকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারলো না, সে নিজের সুটকেশট তুলে নিয়ে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। অগত্যা সুজিতকেও নিজের সুটকেশ তুলে নিয়ে যাবার জন্যে ধীরে ধীরে পা বাড়াতে হোলো।

সুজিত যখন ঘরের বাইরে এসে পৌঁছল ফকির তখন হন্‌হন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে চলে গেছে। সুজিত এদিক ওদিক চেয়ে তাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ডাকলে :

শুনুন, শুনে যান—

কণ্ঠস্বর মঞ্জুর। সুজিতের চিনতে দেরী হলো না।

মঞ্জু নিচে নামবার সিঁড়ির কাঠের রেলিংএর উপর বসে আপেল খাচ্ছিল।

সুজিত সেই দিকে এগিয়ে গেল।

মঞ্জু বললে, কোথায় যাচ্ছিলেন?

বুকের মধ্যে সুজিতের হৃদপিণ্ডটা পিংপংএর বলের মতো লাফিয়ে উঠলো ; সে একটা ঢোক গিলে বললে, এই মানে—এই একটু ঘুরে টুরে দেখছিলাম—

এরপর সুজিত মঞ্জুর তরফ থেকে আরও কয়েকটি কৌতূহলী প্রশ্ন মনে মনে আশা করছিল, কিন্তু মঞ্জু শুধু বললে : ও! বলেই তার ঝকঝকে দাঁতগুলি দিয়ে নিশ্চিন্তমনে আপেলটায় একটা কামড় বসিয়ে দিল।

সুজিত তবুও কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে রইলো। তারপর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এবার আমি যেতে পারি বোধ হয়?

—না, দাঁড়ান। রেলিংএর উপর বসে পা দোলাতে দোলাতে মঞ্জু হুকুম দিলে।

সুজিত বললে, যথা আজ্ঞা, কিন্তু আপনার এ ভাবে বসাটা একটু বিপজ্জনক নয় কি ?

—তা'তে আপনার কি ?

মঞ্জু ভ্রূকুটি করেই বললে কথাটা ; বলতে গিয়ে একটু উত্তেজিত আর অন্যমনস্কও হয়েছিল বোধ হয় ; ফলে কেবল দুটি হাতের সাহায্যে রেলিংএর উপর নিজের ভারটা সামলাতে পারলো না, পড়ে যাবার উপক্রম করলো। বলা বাহুল্য সুজিত তাকে ধরে ফেললো ; শুধু ধরে ফেললো না, রেলিং থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, এইজন্যেই শাস্ত্রে উচ্চাসনে বসতে মানা।

কিন্তু মঞ্জুর চোখে চোখ পড়তেই তার মুখের হাসি তখনই মিলিয়ে গেল। রাগে ফুলতে ফুলতে মঞ্জু বললে, আপনাকে তা বোঝাবার জন্যে আমি ডাকি নি।

সুজিত বললে, কি জন্যে আহ্বান করেছেন তা জানবার সৌভাগ্য কিন্তু এখন আমার হয় নি।

—আপনি আমায় ধরতে গেলেন কেন ? মঞ্জু ফেটে পড়লো।

সুজিত বললে, নিছক পরোপকারের প্রেরণা—ছেলে বেলা থেকে কেমন একটা বিশ্রী স্বভাব, কারও বিপদ দেখলে চুপ করে থাকতে পারি না।

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর এবার রীতিমত তীব্র হয়ে উঠলো ঃ নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উঁচু না ? নিজেকে মস্ত একটা লোক মনে করেন!

—আমায় লজ্জা দেবেন না। ওই আমার একটি মাত্র দুর্ব্বলতা।

—আপনার লজ্জা আছে! লজ্জা থাকলে আপনি এখানে আসতেন না। সুজিত এতক্ষণ সপ্রতিভ ভাবটা কোন রকমে বজায় রেখেছিল, এবার তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুহূর্ত্তের জন্যে। তবে কি মঞ্জু আসল কথাটা…?

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সুজিত বললে ঃ এখানে আমার অনেক বাধা ছিল, কিন্তু লজ্জাটা তার মধ্যে ধর্ত্তব্য বলেই মনে হয় নি। এসে খুব অন্যায় করলাম বোধ হয়।

—বোধ হয় নয়, নিশ্চয় করেছেন। আপনার মতলব আমি জানি।

—তা হলে আমার চেয়ে একটু বেশী জানেন আপনি। এখনও আমি মতলবটা ঠিক করবার সময় পাই নি।

মঞ্জু তবু শান্ত হোলো না, বললে, যা ভাবছেন তা হবে না, বাবা যাই বলুন, আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারবো না।

সুজিতের মনে হোলো কে যেন তাকে মুহূর্ত্তের জন্যে ইন্দ্র লোকে পৌঁছে দিয়ে তখুনি আবার মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, শুনে ভয়ানক হতাশ হ'লাম। কিন্তু এ দুর্ভাগ্যের কারণটা কি শুনতে পাই? আমি অযোগ্য কিসে ঠিক বুঝতে পারছি না।

মঞ্জু বললে, আপনি তো দাঁতের ডাক্তার—একটা দাঁতের ডাক্তারকে আমি বিয়ে করবো মনে করেছেন?

—আমি কিছুই মনে করি নি। কিন্তু দাঁতের ডাক্তার হওয়া কি অপরাধ? দাঁতের ডাক্তার তো নিরীহ ভালো মানুষরাই হয়ে থাকে।

মঞ্জু জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলো। সিঁড়ির নিচে হল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ফকির এতক্ষণে ঘামছিল, এবার সে অধৈর্য্য হয়ে হাত নেড়ে ইসারা করলো সুজিতকে নেমে আসবার জন্য। সুজিত তাকে ইঙ্গিতে আর একটু ধৈর্য্য ধারণ করতে বললে।

মঞ্জু বলে উঠলো: নিরীহ ভাল মানুষ লোক আমি ঘৃণা করি। আপনি যদি ভাল চানতো এই বেলা এখান থেকে সরে পড়ুন।

—এতক্ষণ সেইটেই উচিত বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু এখন কেবল একটু সন্দেহ হচ্চে···আচ্ছা ধরুন, যদি না যাই।

—তা হ'লে আপনাকে পস্তাতে হবে। আপনার জীবন আমি দুর্ব্বহ করে তুলবো।

—না, না, অত লোভ দেখাবেন না, আমি বড় দুর্ব্বল। মনে হচ্ছে বুঝি আর যাওয়া হোল না।

—কিন্তু আপনাকে আমি সাবধান করে দিলাম, মনে থাকে যেন।

—আহা, তাইতেই তো মুস্কিলে ফেললেন।

মঞ্জুর জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করে সুজিত এবার সিঁড়ির দিকে তাকালো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে ফকির ইতি মধ্যে সিঁড়ির উপর উঠে এসেছিল।

সুজিত তাকে এগিয়ে আসতে ইসারা করে দুষ্টুমীভরা একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মঞ্জুর মুখের দিকে।

ফকির দরজার কাছে উঠে আসতেই সুজিত তাকে ঘরে ঢুকে পড়তে বললো।

ফকির ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে সুজিতও।

মঞ্জুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল! কী অসভ্য লোক—uncultured! যেতে বললে যায় না, গালাগালি দিলে অমায়িক ভাবে হাসে, রাগে না, উত্তেজিত হয় না....কী আশ্চর্য্য!

হাতের আধ খাওয়া আপেলটা মঞ্জু ছুঁড়ে মারলো সুজিতের দিকে। সেটা কারও গায়ে লাগলো না। সুজিত হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করে দিলে।

ঘরের মধ্যে ফকির চাঁদ হতাশ হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে ছিল। সুজিত কাছে আসতেই সে প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বললে, শেষে এই তোর মনে ছিল! চলে যাবার কি আর কোন পথ ছিল না?

সুজিত হাসতে হাসতে বললে, তুমি বুঝতে পারছ না ফকির চাঁদ, ভেবে দেখলাম ভাগ্য যখন জুটিয়েই দিয়েছে তখন এরকম একটা আশ্রয় ফট্ করে ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না। দেখাই যাক্ না কি হয়।

—কি হবে তা তো আগেই জানি। তোমার সঙ্গে বেরিয়েই আমার এই সর্ব্বনাশ।

সুজিত কিছু বলবার আগেই বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

ফকির আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠলো : এই রে ওই মেয়েটাই এসেছে আবার ! বাবা, মেয়ে নয় তো, চিতে বাঘ।

সুজিত অবিচলিত ভাবে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখা গেল, মঞ্জুর বদলে রমাকে। একটু কুণ্ঠিত ভাবে সে বললে, আসতে পারি কি ?

সুজিত বললে : নিশ্চয়ই।

রমা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, আপনাদের জন্যে একটু চা নিয়ে এসেছিলাম।

রমার পিছনে পিছনে একজন চাকরকে দেখা গেল চায়ের সরঞ্জাম সমেত ট্রে হাতে।

সুজিত বললে, আপনি আবার এখুনি এ কষ্ট করতে গেলেন কেন ? আমরা তো স্নানটান সেরেই খেতে বসবো। এখন চায়ের কোন দরকার ছিল না।

রমা বললে, না, না, সে কি কথা ! গাড়ীতে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন। আর আমার এতে কিই বা কষ্ট !

চাকর ট্রেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চলে গেল। রমা চা তৈরী করতে লাগলো।

দরজার বাইরে মুহূর্ত্তের জন্য মঞ্জুকে দেখা গেল—মুখ গম্ভীর, চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো শাণিত।

সেখান থেকে সরে এসে মঞ্জু বসলো নিজের ঘরে পিয়ানোর সামনে। হঠাৎ মনটা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে। বাজাতে ভাল লাগছিল না, তবু মঞ্জু বাজাতে লাগলো।

মায়া ছুটতে ছুটতে এসে জিজ্ঞাসা করলে, মনে আছে তো দিদি ?

—কি মনে আছে ? মায়ার দিকে না চেয়েই মঞ্জু প্রশ্ন করলো। মায়া অবাক হয়ে বললে, বাঃ আজ যে আমাদের প্লে।

মঞ্জুর তরফ থেকে কোন উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গেল না, পিয়ানোর রীডগুলোর উপর এলোমেলো আঙুল চালাতে চালাতে মঞ্জু বললে, তা জানি।

মায়া বললে, এদের সকলকে নেমন্তন্ন করতে হবে কিন্তু।

—আবার কাদের নেমন্তন্ন করবি? সবাইকে তো বলা হয়েছে।

বাঃ, এই যে যাঁরা এলেন—এঁদের বলবে না? তোমাকেই বলতে হবে দিদি।

—আমার দায় পড়েছে। পারব না।

মঞ্জু আবার পিয়ানোর দিকে মন দিল। মায়া কিন্তু ছাড়বার মেয়ে নয়। সে হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললেঃ জানি কেন পারবে না। আমি জানি। জানি গো—

—কি জানিস ফাজিল মেয়ে? বেরো এখান থেকে।

মায়া এবার দুষ্টুমীভরা উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে চাইলো। দিদির মুখের দিকে, তার পর বললে, ডাক্তারবাবু কিন্তু বেশ লোক দিদি।

মঞ্জু মিউজিক টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে, হ্যাঁ' ঠিক হায়নার মত।

মায়া ঘুর পাক খেয়ে আর একবার খিল খিল করে হেসে উঠলো, তারপর হাত তালি দিতে দিতে বললেঃ বলে দেব।

মঞ্জু বললে, বলিস তুই।

—দেখো ঠিক বলে দেব।

বলতে বলতে মায়া ছুটলো সেখান থেকে। মঞ্জুও ছুটলো তার পিছনে পিছনে।

পূর্ণিমা থিয়েটারের সাজঘরটা নটবর লাহিড়ীর আগমন উপলক্ষে শয়নকক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ডাক্তার রায়কে সেইখানেই বিশ্রাম করতে দেওয়া হয়েছে। ঘরের দেয়ালে ঝুলছে নানাবিধ রংচঙে পোষাক—রাজা থেকে বাউল সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সবার। গোবিন্দ কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে সেগুলি নিরীক্ষণ করছে।

ডাক্তার রায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, আমি কিন্তু এখানে কিছুতেই থাকবো না গোবিন্দ, কিছুতেই না।

গোবিন্দ মন দিয়ে একটা জরির পোষাক পরীক্ষা করছিল, কথাটা তার কানে গেল না। ডাক্তার রায় আবার চীৎকার করে উঠলেন : আমি বলছি, আমি এখানে কিছুতেই থাকতে পারবো না। বুঝেছ গোবিন্দ ?

গোবিন্দ পোষাকটা দেখতে দেখতেই জবাব দিলেঃ বুঝেছি স্যার।

—বুঝেছি স্যার। ডাক্তার রায় ধমকে উঠলেন : কি বুঝেছ ?

—আজ্ঞে, আপনি এখানে থাকবেন না।

—কিন্তু কেন থাকবো না বুঝেছ ?

—না স্যার, আমি বুঝতে পারছি না। এমন খাশা জায়গা ছেড়ে……

—খাশা জায়গা ? তুমি এটাকে খাশা জায়গা বলো। জানো এরা আমায় গান গাইতে বলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ মানে ? এরা আমাকে গান গাইতে বলে আর তুমি বলছো আজ্ঞে হ্যাঁ ?

গোবিন্দ এবার একটু বিব্রত হয়ে বললে, কি বলবো তা হলে স্যার ?

ডাক্তার রায় সশব্দে চায়ের পেয়ালাটা ঠেলে রেখে বললেন : আমার মাথা বলবে, মুণ্ডু বলবে—

আপনি রাগ করছেন স্যার !

—রাগ করবো না ! আমি দাঁতের ডাক্তার, আমি গান গাইতে যাব কেন ?

—কিন্তু এদের যেন গানের দিকেই ঝোঁক বেশী মনে হচ্ছে স্যার, দাঁত সম্বন্ধে কোন আগ্রহ তো দেখছি না !

ডাক্তার রায় এবার কতকটা শান্ত ভাবে বললেন : আমিও তো তাই বলছি। দাঁত সম্বন্ধে যারা উদাসীন তাদের এখানে আমি একদণ্ড থাকতে চাই না। তুমি গাড়ী ডাক গোবিন্দ, আমি এখুনি চলে যাব।

—কিন্তু স্যার—

—আবার কিন্তু কি ?

না···এই বলছিলুম কি···আজ থিয়েটারটা দেখে গেলে হোতো না ?

ডাক্তার রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না, না, তুমি যাও, এখুনি গাড়ী ডেকে আনো। আর শোন, এরা কেউ যেন টের না পায়। কাউকে কিছু বোলো না। খুব চুপি চুপি যাবে, বুঝেছ ?

গোবিন্দ উপায়ান্তর না দেখে বিমর্ষ মুখে বেরিয়ে গেল।

ম্যানেজার তাঁর ঘরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গড়গড়া টানছিলেন, সখীসঙ্ঘের একটি মেয়ে তাঁর মাথার পাকাচুল তুলে দিচ্ছিল। কয়েকজন অভিনেতা একপাশে বসে গল্পগুজব করছিল।

গোবিন্দকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে নকড়ি হাঁক দিলেন : কি গো গোবিন্দবাবু চলেছ কোথায় ?

গোবিন্দ দরজার সামনে এসে বললে, একটু কাজে। মানে—দেখুন, একটা গাড়ী ডাকিয়ে দিতে পারেন ?

—গাড়ী ? গাড়ী কি হবে ?

গোবিন্দ এবার সাবধান হ'বার চেষ্টা করলো : ওইটি আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না, বলতে পারবো না।

ম্যানেজার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। গড়গড়ার নলটা নামিয়ে রেখে বললেন, সে কি হে ! গাড়ী ডাকিয়ে দিতে বলছো, অথচ কেন গাড়ী চাই তা বলতে পারবে না ?

—আজ্ঞে না, গাড়ী আপনি ডাকিয়ে দিন। আর কিছু আমি বলতে পারবো না।

নকড়িকে এবার উঠে দাঁড়াতে হোলো।

—ব্যাপারটা কি বলো তো? যাবে কোথায়? আর এখন গেলে ফিরেই বা আসবে কখন?

—গেলে আর ফিরে আসছি!

বলেই গোবিন্দর খেয়াল হোলো যে কথাটা প্রায় বেফাঁস করে ফেলেছে। তখনই প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, উঁহুঁ, আমি কিছু বলতে পারব না।

আর কিছু বলবার দরকার ছিল না। গোবিন্দর মুখ থেকে যেটুকু আভাস পাওয়া গেছে ঝানু নকড়ির কাছে তাই যথেষ্ট। তিনি চীৎকার করে উঠলেন: তোমার ঘাড় বলবে। বলি মতলবটা কি তোমাদের? আমাদের ফাঁসিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে চাও? দাঁড়াও দেখচি—

ফ্যালারামের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তিনি সাজঘরের দিকে ছুটলেন। গোবিন্দ তাঁর পিছনে যেতে যেতে বললে, দেখুন, আমি কিন্তু কিছু জানি না—

গাড়ীর অপেক্ষায় ডাক্তার রায় উত্তেজিত হয়ে সাজঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। নকড়ি ফ্যালারাম আর গোবিন্দকে নিয়ে ঘরে ঢুকেই চেঁচাতে সুরু করলেন, এ আপনার কি রকম ব্যবহার মশাই? চালাকী করবার আর জায়গা পান নি? সারা শহরে পোষ্টার পড়ে গেছে—সব টিকিট বিক্রী, এখন আপনি পালাতে চান?

ডাক্তার রায় নকড়ির কথার বিন্দু বিসর্গ বুঝতে না পেরে বললেন, কি বলছেন আপনি?

—কি বলছি বুঝতে পারছেন না? লুকিয়ে লুকিয়ে গাড়ী ডাকতে পাঠিয়েছিলেন কি জন্যে?

ডাক্তার রায় এবার রোষ-কষায়িত নেত্রে গোবিন্দর দিকে চাইলেন।

গোবিন্দ বললে, আমি কিন্তু কিছু বলিনি স্যার!

নকড়ি আবার চেঁচাতে সুরু করলেন: কারও কিছু বলবার দরকার নেই। আপনার চালাকী আমি গোড়া থেকেই ধরতে পেরেছি। পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজার, বিশ বছর থিয়েটার চালাচ্ছি মশাই—আপনার মত ঢের ঢের য়্যাক্টর আমার দেখা আছে। দেখি আপনি কোথায় পালান—দেখি ষ্টেজে নেমে আপনাকে গান গাইতে হয় কি না।

ব্যাপারটা ডাক্তার রায়ের কাছে এবার পরিষ্কার হয়ে আসছিল, তিনি বললেন, কিন্তু দেখুন···আপনাদের একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে।

···ভুল তো হয়েছেই। আপনার মতো য়্যাক্টরকে খাতির করে বায়না দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছি, ভুল আমার হয় নি? কিন্তু তাই বলে পুরোপুরি লোকশান দিতে রাজী নই জানবেন। কই হে ফ্যালারাম, ডাক সবাইকে, গানের রিহার্স্যাল এখুনি বসবে—

নকড়ির হুকুমে ফ্যালারাম সত্যি আর সবাইকে ডাকবার জন্যে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার রায় মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন: কি আশ্চর্য্য! আমি কতবার আপনাদের বলবো আমি গান জানি না, আমি য়্যাক্টর নই।

নকড়ি তবু নিরস্ত হলেন না, বললেন, ক্রমে ক্রমে আরও কত কি বলবেন, বলুন আপনি নটবর লাহিড়ী ন'ন?

—তা ত নই। সেই কথাই তো বলছি—

—কথা আর আমি শুনতে চাই না মশাই। আপনি যদি বলেন, চিড়িয়াখানার খাঁচার শিক ভেঙ্গে পালিয়ে এসেছেন, তবু আমি ছাড়বো না।

ডাক্তার রায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পূর্ণিমা থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেত্রী কুসুমিকা এসে ঢুকলো ঘরে।

—এত গণ্ডগোল কিসের বলুন দেখি! কি হয়েছে কি?

কুসুমিকাকে দেখেই ম্যানেজার বললেন, এই যে বুঁচি এসে পড়েছিস, মাইরি দেখ দেখি কাণ্ডটা—

নকড়ি ডাক নাম ধরে ডাকায় কুসুমিকা খুসী হলো না, ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, ম্যানেজারবাবু—

ম্যানেজার ভুল শুধরে নিয়ে বললেন, থুড়ি কুসুমিকা দেবী আসুন, আসুন। দেখুন কি মুস্কিল হয়েছে এই আমাদের বড় য়্যাক্টর নটবর লাহিড়ী—

নকড়ির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কুসুমিকা ডাক্তার রায়কে নমস্কার জানিয়ে বললে, ও আপনিই নটবর লাহিড়ী। আপনার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত খুসী হ'লাম। আপনার অভিনয় কখনও দেখিনি, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে—

ডাক্তার রায় কি বলবেন ঠিক করতে না পেরে বলে ফেললেন, হ্যাঁ···আমিও···

—না, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি, তবে আমার নাম হয়তো আপনি শুনে থাকবেন।

কুসুমিকা এর উত্তরে একটা প্রশংসাসূচক মন্তব্য আশা করছিল, কিন্তু ডাক্তার রায়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কই না তো!

কুসুমিকার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, নকড়ি তাল সামলাবার জন্যে বললেন, আরে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতেই ভুলে গেছি। ইনিই কুসুমিকা দেবী। আজ বিশবছর ধরে আমাদের পূর্ণিমা থিয়েটারের হিরোইন্······

নকড়ির শেষ কথাটায় কুসুমিকা চটে উঠলো, বললে, ম্যানেজার-বাবু, আমায় অপমান করবার অধিকার আপনার নেই।

—অপমান! নকড়ি যেন আকাশ থেকে পড়লেন: অপমান আবার কখন করলাম!

কুসুমিকা ঝাঁঝিয়ে উঠলো: অপমান নয়? আপনি বলতে চান, বিশ বছর আমিই আপনাদের একমাত্র হিরোইন।

নকড়ি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে না পেরে বললেন, সে কথা তো আমরা সগর্ব্বে বলে থাকি!

—তা বলবেন বইকি! আমার বয়স না বাড়ালে আপনার সুখ হবে কেন? বিশ বছর ধরে আমি হিরোইন সাজছি—তা হলে আমার বয়স কত হোলো শুনি? আমি কি চালশে বুড়ি?

নকড়ি এতক্ষণে কুসুমিকার রাগের কারণটা বুঝতে পারলেন, বললেন, না, না, তুমি বিশ বছরের ছুঁড়ি, আঁতুড় ঘর থেকে এসে আমাদের হিরোইন সাজছো। ছ্যাখ বুঁচি, সখী সেজে এক দুই তিন করে পায়ে তো চড়া পড়ে গিয়েছিল। আমার দেখতা হিরোইন হলি, আমার কাছে আর চাল মারিস না।

কুসুমিকাও ছাড়বার পাত্রী নয়, তার কাংসবিনিন্দিত পেটেণ্ট গলার ঝঙ্কার দিয়ে বললে, তবেরে মট্‌রা, সাজঘরে মেয়েদের মুখে রং মাখিয়ে পায়ে ঘুমুর বেঁধে দিতিস, আজ বড় ম্যানেজারী ফলাতে এসেছিস না? তোর দেখতা আমি হিরোইন হয়েছি নারে মুখপোড়া?

নকড়িও সমান পাল্লা দিয়ে চেঁচাতে সুরু করলেন: ছ্যাখ বুঁচি, খবরদার বলে দিচ্ছি—সত্যি বলছি আমি রেগে যাব—রেগে গিয়ে একটা কুরুক্ষেত্র করে বসবো।

—করো না কুরুক্ষেত্র; আমি কি ভয় করি নাকি। হাটে হাঁড়ি আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি। বলি কা'র পয়সায় তোর থিয়েটার চলছে রে হতচ্ছাড়া? আমায় তুই অমনি হিরোইন করেছিস? আমি না থাকলে কোন চুলোর দুয়োরে ম্যানেজারী করতিস?

জোঁকের মুখে নুন পড়লে যে রকম অবস্থা হয় ম্যানেজারের অবস্থা দাঁড়াল ঠিক সেই রকম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুর গেল পাল্টে: আহা, থাক, থাক, থাক···

—কেন থাকবে কেন?

—আহা চটিস কেন? মাইরি বুঁচি, থুড়ি কুসুমিকা দেবী, এই নাক কান মলা খাচ্ছি—কোন্ ব্যাটা আর বয়সের কথা তোলে। তুই চট্ করে একটা গান শুনিয়ে দে দেখি—

—আমার গান গাইতে দায় পড়েছে। কুসুমিকা একটা ঝাঁকানি দিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

—আহা রাগ করিস কেন! নটবরবাবুকে একটা গান শুনিয়ে দিবি নে। উনি মনে করবেন কি! কি বলেন নটবরবাবু?

নকড়ি ডাক্তারের মুখের দিকে চাইলেন। ডাক্তার এতক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে কুসুমিকা নকড়ির বচনামৃত পান করছিলেন, নকড়ির শেষ কথাটায় চমকে উঠে তিনি বললেন, আমায় কিছু বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আবার কাকে! নকড়ি এবার হাসতে হাসতে বললেনঃ আমাদের হিরোইনের একটা গান শুনুন। আপনাদের কলকাতায় এমন গান পাবেন না মশাই। কই হে ফ্যালারাম হারমোনিয়ামটা কই?

ফ্যালারাম হারমোনিয়ামটা নিয়ে এলো। তারপর সেইখানেই সকলে বসলেন। গোবিন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠলো! ডাক্তারবাবু যেন কি! এমন গান বাজনা ছেড়ে···। কুসুমিকা হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বললেঃ আমার কিন্তু ভারী লজ্জা করে।

আমেরিকা ফেরৎ ডাক্তার রায়ের জন্যে চেয়ারম্যান অধরবাবু সে রাত্রে বিলিতি প্রথায় খাওয়া দাওয়ার একটু বিশেষ আয়োজন করেছিলেন এবং তার ফলে সুজিত ও ফকিরকে বাড়ীর আর সকলের সঙ্গে ডিনার-টেবলে বসে কাঁটা-চামচ ধরতে হয়েছিল। বাবুর্চ্চি খাদ্যবস্তুগুলি পরিবেশন করে যাবার পর মঞ্জু এসে ঘরে ঢুকলো। সুজিতের পাশের চেয়ারটাই শুধু খালি ছিল, বসতে গেলে সেইটাতেই বসতে হয়। মঞ্জু কিন্তু বসলো না, মুখ গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে রইলো।

রায়বাহাদুর বললেন, কই মা মঞ্জু, বোসো।

মঞ্জু চেয়ারটা সুজিতের কাছ থেকে সশব্দে খানিকটা সরিয়ে এনে বিরক্তভাবে তাতে বসে পড়লো। সবাই অবাক হয়ে চাইলো মঞ্জুর দিকে।

ফকিরচাঁদ কাঁটা-চামচ সামনে দেখে বিষম বিব্রত বোধ করছিল, তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কোন শোকসভায় যোগদান করতে এসেছে।

আহার পর্ব্ব সুরু হোলো। কিন্তু মুস্কিল হোলো ফকিরের। জীবনে সে কোনদিন কাঁটা-চামচ ব্যবহার করেনি। কোন হাতে কাঁটা আর কোন হাতে চামচ ধরতে হয় সেটুকুও বেচারীর জানা নেই। আর পাঁচজনের দেখাদেখি কোন রকমে সে কাঁটা চামচ ধরলো বটে, কিন্তু এমন বে-কায়দায় ধরলো যে প্লেটের খাদ্য বস্তু কিছুতেই মুখের কাছে উঠতে চাইলো না। বেগতিক দেখে সুজিত তাকে ইশারায় কাঁটা চামচ ধরবার সঠিক প্রণালীটা জানাতে লাগলো।

ব্যাপারটা মঞ্জুর চোখ এড়াল না, মুখ তার আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো।

সুজিত বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি মঞ্জুকে বললে, তখন সময় পাইনি, আপনার আপেলটা দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।

মঞ্জু জবাব না দিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইলো।

রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে বললেন, মঞ্জু বুঝি এরি মধ্যে আপনাকে আপেল দিয়ে এসেছে। বেশ, বেশ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপেলও পেয়েছি, চাও পেয়েছি।

কথাটা বলে সুজিত রমার দিকে চাইলো। রমা লজ্জিত ভাবে হাসলে।

রায়বাহাদুর বললেন, কিন্তু আপনার খাবার বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে মিঃ রায়, আমাদের এখানকার রান্না কি ঠিক—

—উহুঁ, কিছু ভাববেন না রায়বাহাদুর। খেতে পেলেই আর আমাদের খাওয়ার কষ্ট থাকে না। বিশ্বাস না হয়, ফকির চাঁদকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। ফকির কাঁটা-চামচ ধরার কায়দাটা আয়ত্ত করতে না পেরে হাত দিয়ে একখানা কাটলেট তুলে খাবার চেষ্টা করছিল মরিয়া হয়ে, রায়বাহাদুর তার দিকে চাইতেই সে তাড়াতাড়ি

হাতটা সরিয়ে নিয়ে বোকার মত চেয়ে রইলো। এবারও ব্যাপারটা মঞ্জুর চোখ এড়ালো না, সুজিতের দিকে চেয়ে সে ব্যঙ্গকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আপনার বন্ধুটি কি আপনার সঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিলেন মিষ্টার রায়?

সুজিত বললে, না শেষ পর্য্যন্ত যেতে পারে নি।

রমা বললে, উনি কতদূর গিয়েছিলেন?

সুজিত বললে, আউটরাম ঘাট পর্য্যন্ত—আমায় তুলে দিতে।

সুজিতের কথায় অনেকে হেসে উঠলো, মঞ্জু শুধু মুখ ভার করে রইলো।

রায়বাহাদুর সুজিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো চিকাগোতে গিয়েছিলেন? কোন দিক দিয়ে? নিউইয়র্ক না স্যানফ্রান্সিসকো?

মুহূর্ত্তের জন্যে কাটলেটের টুকরোটা সুজিতের গলায় আটকে যাবার উপক্রম হলো, কোন রকমে সেটা গিলে ফেলে সুজিত বললে, দেখুন, তখন একরকম দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম, ও আর জিজ্ঞাসা করবেন না······

রায়বাহাদুর কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না, বললেন, আপনার অভিভাষণে কিন্তু আমরা আপনার আমেরিকার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই।

—নিশ্চয় শুনবেন; করুণ ও নিদারুণ আমার সব অভিজ্ঞতার কথাই তো বলবো ঠিক করেছি।

—দাঁতের কথা বাদ দেবেন না যেন।

—আজ্ঞে না, দাঁত বাদ দিলে আর থাকবে কি।

—আচ্ছা, আমেরিকায় মেয়েরা নাকি দাঁতের ডাক্তার হয়? রমা জিজ্ঞাসা করলে।

সুজিত বললে, দেখুন ওদেশের মেয়েরা পুরুষ ছাড়া কি যে না হয় বলতে পারি না। আজকাল মাঝে মাঝে তাও হচ্ছে শুনতে পাই।

রমা বললে, ভারি বেহায়া দেশ কিন্তু যাই বলুন।

—নিজে না দেখেই বেহায়া বলে দিলে রমাদি? মঞ্জু টিপন্নী কাটলে।

রমা বললে, দেখবো আবার কি! শুনতে তো পাই। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায় কোন্ লজ্জায়?

—লজ্জা নয়, হয়তো পুরুষদের লজ্জা দিতে, কি বলেন মিস্ চ্যাটার্জ্জী? কথাটা বলে সুজিত চাইলো মঞ্জুর দিকে।

মঞ্জু বললে, অনেককে লজ্জা দেওয়ার চেষ্টাও বৃথা।

বাঁকা একটা চাউনী নিক্ষেপ করলো সে সুজিতের দিকে।

রায়বাহাদুর বলে উঠলেন, কি কথা থেকে কি কথা যে বলিস আমি বুঝতে পারি না। কোথায় ডাক্তার রায়ের কাছে দুটো dentistryর কথা শুনবো, না যত বাজে কথা—

মঞ্জু বললে, তুমি যত পার লেকচার শোন বাবা, আমার অত মাথা বা দাঁতের ব্যাথা নেই। বলেই সে প্লেটটা সরিয়ে রেখে টেবল ছেড়ে উঠে পড়লো। কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রায়বাহাদুর বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, কি হোলো মঞ্জুর, হঠাৎ অমন করে চলে গেল যে! দেখ না মা রমা।

মঞ্জু উঠে যাওয়াতে রমা মনে মনে খুশী হয়েছিল, কিন্তু রায়বাহাদুরের হুকুম, অমান্য করবার উপায় নেই, উঠতে উঠতে মুখ ভার করে সে বললে, কি জানি ওর মেজাজ বোঝাই ভার, যাই দেখি আবার—

সবাই অন্যমনস্ক রয়েছে দেখে ফকির এই ফাঁকে কাটলেটের একটা টুকরো কোন রকমে মুখের ভিতর চালান করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু চেষ্টা সফল হোলো না, কাঁটা থেকে বিচ্যুত হয়ে টুকরোটা ছিটকে গিয়ে পড়লো একেবারে রায়বাহাদুরের গায়ে— তাঁর পরিষ্কার ধবধবে জামাটার উপর সঙ্গে সঙ্গে একটা দাগ হয়ে গেল। মনে মনে মৃত্যুকামনা করলে ফকিরচাঁদ, কাঁটা হাত থেকে টেবলের ওপর পড়ে গেল। সবাই কটমট করে তার দিকে চেয়ে

আছে দেখে ফকির নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে বলে উঠলো : মাছ মাংস খাই না কি না, আমি একেবারে ভেজিটেবিল।

ফকিরের বলবার ইচ্ছা ছিল যে সে একেবারে নিরামিষাশী, কিন্তু ঠিক ইংরিজী প্রতিশব্দটা মনে করতে পারল না।

প্রাণপণে হাসি চেপে স্তম্ভিত অধরবাবুকে বললে, কিছু মনে করবেন না রায়বাহাদুর। গোলযোগের মধ্যে কেউ কেউ টেবল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, রায়বাহাদুর বলে উঠলেন, না, না, মনে করবো কেন। তা আপনারা উঠলেন কেন? ফকিরবাবু, আপনাকে আর একখানা কাটলেট—?

আবার কাট্‌লেট! তার চেয়ে ফকির বরং নিজের মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে রাজী আছে। রায়বাহাদুরের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, আজ্ঞে না, আমার খিদে নেই।

টেবলের ওপর সাজানো নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্যগুলির দিকে চেয়ে গোপন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে ফকিরচাঁদ। খিদেয় তার পেটের ভেতরটা ফুটো ফুটবল ব্লাডারের মতো ক্রমশঃ চুপষে যাচ্ছিল।

মঞ্জু তার ঘরে জানলার কাছে একা দাঁড়িয়েছিল, রমা এসে বললে, অমন করে চলে এলে যে মঞ্জু? ডাক্তার রায় কি মনে করবেন বলো তো!

—ডাক্তার রায়ের মন নিয়ে তো আমার মাথা ব্যথা নেই, তোমার থাকে তো গিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারো। কথাটা বলতে বলতে মঞ্জু ঘুরে দাঁড়াল।

রমা বললে, যা মুখে আসছে বলছো যে। সান্ত্বনা দেবার লোক তুমি না আমি?

—আমি কেন হ'তে যাব! আমার দায় পড়েছে—

—দায় পড়ে কি না পরে বুঝবে। এরকম মেজজ কিন্তু ভাল নয়।

—কেন বলতো?

—ডাক্তার রায় ভুল বুঝতে পারেন।

—ডাক্তার রায়, ডাক্তার রায়। মঞ্জু এবার ঝাঁঝিয়ে উঠলো : তোমাদের সকলের কাছে ওই নামটা জপমালা হয়ে উঠেছে। ডাক্তার রায় ঠিক বুঝুন, ভুল বুঝুন, আমার কি!

রমা একটু আশ্চর্য্য হয়ে মঞ্জুর দিকে চাইলো, তারপর বললে, কিছু নয় তো? ঠিক বলছো?

মঞ্জু বললে, বেঠিক কেন বলবো? কি তোমার হয়েছে বলো তো? যত সব বাজে বাজে কথা জিজ্ঞাসা করছো। আমি চললাম, মায়ার আজ আবার অভিনয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

মঞ্জু ঘর থেকে চলে গেল। রমা দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। তার মুখ দেখে মনে হোলো—কি এক অজানা কারণে সে মনে মনে রীতিমত খুশী হয়ে উঠেছে। পিয়ানোয় গিয়ে বসলো রমা।

ডিনার টেবল থেকে উঠে উপরে এসেই ফকির বললে, ক্ষিদে পেয়েছে।

সুজিত বললে, বল কি হে? এই মাত্র যে ডিনার-টেবল থেকে উঠে এলে?

—উঠে এলুম তো কি হোলো? ফকির বেশ রাগত ভাবে বললে : খাবার চোখে দেখলেই পেট ভরে না কি!

—চোখে দেখলে মানে?

—চোখেই তো দেখলাম। ওই ছুরি কাঁটা দিয়ে মুখে কিছু তোলা যায়। তোমার সঙ্গে এসেই এই দুর্দ্দশা। জেলে তো যেতেই হবে, তার আগে পেট্টাও ভরলো না! আমি এখানে কিছুতেই থাকবো না।

সুজিত সান্ত্বনাচ্ছলে বললে, আহা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন! তোমার খেতে পেলেই তো হোলো।

নাঃ, আমার খাবার আর দরকার নেই। ঢের সুখ হয়েছে, আমি চললাম।

—এরি মধ্যে কোথায় চললেন ফকিরবাবু? রায়বাহাদুর ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

ফকির তিক্ত-বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, আজ্ঞে না, খাওয়া হয়েছে, আর বিশ্রামের দরকার নেই।

অধরনাথ বিস্মিত, বিব্রত হয়ে সুজিতের মুখের দিকে চাইলেন। সুজিত তাড়াতাড়ি বলে উঠলো: ফকিরচাঁদের একটা বদ অভ্যাস আছে রায়বাহাদুর, বেশী খাওয়ার পর ও বিশ্রাম করতে পারে না, একটু ঘুরে বেড়ান ওর চাইই—

অধরনাথ বললেন, বেশ তো। আপনাদের এখনও বাড়ীটাই দেখান হয়নি। আসুন না ঘুরে টুরে সব দেখবেন।

সুজিত বললে, তাই চলো না ফকিরচাঁদ, ঘুরে টুরে খাওয়াও হজম হবে, বাড়ীটাও দেখা হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি।

রায়বাহাদুর উৎসাহ করে ওদের বাড়ী-ঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন। উপর থেকে নিচে, এ-ঘর থেকে ও-ঘর। ফকিরচাঁদের ক্ষুধার তাড়না ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো ব্যথা করতে লাগলো, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলে না। এই ঘুরে বেড়ানর মধ্যে সুজিতের একটা মতলব ছিল এবং মতলবটা ফকিরচাঁদের জন্যই, কিন্তু ফকির তার কিছুই বুঝতে না পেরে মনে মনে সুজিতের আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লাগলো।

নিচেতলায় এসে সুজিত খানিক পরে বললে, কি হে, পিছিয়ে পড়ছো কেন ফকিরচাঁদ? এতক্ষণে খাওয়া হজম হয়ে গেছে নিশ্চয়।

ফকির গোমড়া মুখে জবাব দিলে: হ্যাঁ।

—আবার ক্ষিদে পেয়ে থাকে তো বলুন? রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন।

ফকির দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দিলে: আজ্ঞে না—

সুজিত বললে, আচ্ছা রায়বাহাদুর, আপনার বাড়ীর সব তো

দেখা হোলো। কিচেন্‌টাই বা বাদ যায় কেন? ভাঁড়ার বা রান্নাঘর এগুলোও একবার দেখা দরকার—

ফকির প্রতিবাদ জানাল: না, না, ভাঁড়ার বা রান্নাঘর দেখবার কোন দরকার নেই।

রায়বাহাদুর বললেন, না, না, ভাঁড়ার রান্নাঘরটাও দেখুন না; যতদূর সম্ভব আধুনিক ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করেছি।

সুজিত বললে, খাওয়া তো হজম হয়ে গেছে, আর ভয় কি ফকিরচাঁদ। চল, চল।

রায়বাহাদুর ওদের নিয়ে কিচেনে এলেন। সত্যিই একেবারে আধুনিক ব্যবস্থা। ইলেকট্রিক উনুন থেকে, রেফ্রিজারেটর পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় নি। মিটসেফের ভেতর ঝকঝকে কাঁচের প্লেটে নানাবিধ খাদ্যবস্তু থরে থরে সাজানো। ফকিরের রসনা জলময় হয়ে উঠলো, নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো ঘন ঘন। রায়বাহাদুর যদি দু'মিনিটের জন্যেও ঘরের বাইরে যেতেন, তা হলেই······

রায়বাহাদুর রেফ্রিজারেটর খুলে তার কায়দা-কানুনগুলো দেখাচ্ছিলেন।

শেলফের ওপর কয়েকটা ট্রে-তে কেক-পেষ্ট্রিজ প্রভৃতি সাজান ছিল, সুজিত সে দিকে ফকিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে: বাঃ, চমৎকার! দেখলে খিদে পায়, কি বলো?

ফকির বিরক্তভাবে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে মনে মনে সুজিতের মুণ্ডপাত করতে লাগলো। সুজিত বললে, খাওয়া সম্বন্ধে ফকির-চাঁদের বৈরাগ্য বড় বেশী রায়বাহাদুর—

রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে ফকিরের দিকে চাইলেন। সুজিত সেই অবসরে খানকয়েক কেকের টুকরো তুলে নিয়ে ফকিরের হাতে গুঁজে দিল। রায়বাহাদুর দেখতে পেলেন না, রেফ্রিজারেটর বন্ধ করে ওদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ওরা কিচেন থেকে বেরতেই দেখা গেল মায়া তাদের দলবল নিয়ে অভিনয়ের জন্যে সেজে গুজে এই দিকেই আসছে। রায়বাহাদুরকে

সুজিতের মুখ শুকিয়ে এসেছিল, তবুও সে উৎসাহের ভাবটা বজায় রেখেই বললে, নিশ্চয় বলবেন, বলা উচিৎ।···কালই তিনি আসছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ, টেলিগ্রাফ করে তো তাই জানিয়েছে ? অবশ্য কাজটা তার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। কাল আপনাকে সঙ্গে করে আনাই তার উচিৎ ছিল। সঙ্গে তো আসেই নি, টিকিটটা পর্য্যন্ত কিনে দেয় নি···ছি, ছি!

—যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। ওকথা আর তুলবেন না। হয়তো বিনোদবাবু এলে আমাদের আসা আর হয়ে উঠতো না।

রায়বাহাতুর সুজিতের কথার গূঢ় অর্থটা ধরতে পারলেন না, কিন্তু কোথায় যেন একটা খট্‌কা লাগলো, তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে সুজিতের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আজ্ঞে···

সুজিতও ভুল শোধরাবার চেষ্টা করলো : না, বলছিলাম, এক সঙ্গে আসা হয়তো আমাদের ভাগ্যে নেই। তবে কাল বিনোদবাবু নিশ্চয় আসছেন, কি বলুন ?

রায়বাহাতুর বললেন, না এসে যাবে কোথায়!

—ঠিক, না এসে যাবে কোথায়! সুজিত এবার তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিল মঞ্জুর দিকে, হাসবার চেষ্টা করে বললে, আপনি এত চমৎকার বাজান তা জানতাম না।

—আমার সম্বন্ধে আর সব কথাই বুঝি জানতেন ? মঞ্জু বললে।

—না, কিছুই জানতাম না, সেইটাইতো আফশোস।

—জেনেও আফশোস করবেন।

—আফশোস যখন করতেই হবে, তখন না জেনে করার চেয়ে জেনে করাই ভাল নয় কি ?

—আপনার যা অভিরুচি।

মঞ্জু ঠাট্টা করলো কিনা বোঝা গেল না। সুজিত একটু চুপ করে থেকে বললে, বললে বিশ্বাস করবেন না, অভিরুচি প্রবল, কিন্তু অবসর মিলবে কি না তাই ভাবছি।

কথাটা ভাল বুঝতে না পেরে মঞ্জু একটা সন্দিহান দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সুজিতের মুখে। মঞ্চে উপর যবনিকা উঠলো। অগত্যা সেই দিকেই মন দিতে হোলো সকলকে।

ফকিরচাঁদ মায়াদের অভিনয় দেখতে যাবার সময় করে উঠতে পারে নি। সুজিতের সংগৃহীত কয়েকখানা কেক উদরস্থ করে এবং তার সঙ্গে পূর্ণ দুটি গ্লাস জল সংযোগ করে সারাদিনের পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা-জনিত অবসাদে হঠাৎ কি রকম মুহ্যমান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল—আর উঠবার চেষ্টা করেনি। অভিনয় দেখে সুজিত যখন উপরে উঠে এলো ফকির তখন ঘুমের সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। সুজিতও যথেষ্ট ক্লান্তি বোধ করছিল, ফকিরকে না জাগিয়ে সেও নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ঘুমের সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ফকিরচাঁদ স্বপ্ন দেখছিল—নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়, থরে থরে তার চারিদিকে সাজান; শুধু সাজান নয়, এত কাছে যে হাত বাড়ালেই সেগুলি সোজা মুখ-গহ্বরে চলে আসতে পারে। এই পরম লোভনীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে ফকির উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলো বিছানার উপর। উত্তেজনার আতিশয্যে ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল; ফকির চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলো যে খাবার জিনিষ মনে করে সে মাথার বালিশটা কখন প্রাণপণে কামড়ে ধরেছে। ক্ষুব্ধ মর্ম্মাহত ফকির বালিশটা ছুঁড়ে ফেলে বিছানা থেকে নামলো। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে ফেললে। তারপর অস্থিরভাবে খানিক ঘুরে বেড়াল ঘরের মধ্যে—মুখ দেখে মনে হোলো সে যেন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছে, হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের সঙ্কল্পের মত একটা কিছু।

এত বড় একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ফকিরের মিনিট দুইয়ের বেশী

সময় লাগলো না। ভেজান দরজা খুলে ফকিরচাঁদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

ফকিরের বালিশ ছুঁড়ে ফেলার শব্দে সুজিতের ঘুম আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল, এতক্ষণ সে নিজের বিছানায় পড়ে নিঃশব্দে তার বিচিত্র কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। ফকির ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও বিছানা ছেড়ে তার সঙ্গ নিল।

দেখা গেল ফকির সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে এলো। তারপর চললো কিচেনের দিকে। নিচেতলার আলো নিভানো ছিল, ফকির অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে সুইচ খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ পা লেগে কি একটা জিনিষ সশব্দে পড়ে গেল। ফকির আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর আবার খুঁজতে খুঁজতে একটা সুইচের সন্ধান পেল। আলো জ্বলতে সে দ্রুত পদে লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হোলো। সুজিত একটু তফাতে থেকে অনুসরণ করছিল, ফকির জানতে পারলে না।

উপরে মঞ্জু তার ঘরে শুয়ে ইংরিজী একটা গল্পের বই পড়ছিল, ফকিরচাঁদের অসাবধানতায় নিচে যে শব্দ হয়েছিল সেটা তার কানে গেল। কৌতুহলী হয়ে সে বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখলো নিচে আলো জ্বলছে। আরও কৌতুহলী হয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে সুরু করলো।

ফকিরচাঁদ তখন রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আলোও জ্বালা হয়েছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ফকিরের, খাবার জিনিষ ছাড়া আর কোন কথা তার মনে নেই। চোখের সামনে যা কিছু পাওয়া গেল তাই দু'হাতের মুঠোয় ভর্ত্তি করে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে ফিরে দাঁড়াতেই দেখলো, সুজিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে ফকিরচাঁদ বোধ হয় চেঁচাতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাইরে সেই সময় মঞ্জুর শ্লীপারের শব্দ শোনা গেল। ফকিরের মুখ ছায়ের মত শাদা হয়ে গেল, সে কাঁদবে, চাৎকার করবে না কোন

একটা আলমারীর মধ্যে ঢুকে যাবে কিছুই ঠিক করতে পারলো না। শেষ পর্য্যন্ত স্থির করলে, পালাবে। যা থাকুক কপালে, পালাবে। ফকির দৌড় দেবার চেষ্টা করতেই সুজিত তার গেঞ্জি টেনে ধরলো, চাপা গলায় বললে, আহম্মক! এখন পালাবে কোথায়—?

ফকির বললে: তা হ'লে—?

সুজিত বললে, শোন যা বলি। কে আসছেন তা জানি না, কিন্তু তাঁকে আমি যা বলবো তুমি শুধু মুখ বুঁজে শুনে যাবে। 'হ্যাঁ', 'না', কিছু বলবে না, চোখের পাতা যদি না ফেলে থাকতে পারো তা হ'লে আরও ভাল হয়।

পায়ের শব্দ রান্নাঘরের দরজায় এসে থামলো। তারপর শোনা গেল মঞ্জুর গলা: ভেতরে কে?

পর মুহূর্ত্তেই মঞ্জু ভিতরে ঢুকলো।

ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন ভাবে উঠে দাঁড়ায়, দেখা গেল ফকির ঠিক সেই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্জু কি বলতে যাচ্ছিল, সুজিত ইসারা করে তাকে কথা বলতে নিষেধ করলে।

ফকির ঠিক তেমনি ভঙ্গীমায় এগিয়ে যেতে লাগলো।

মঞ্জুর মতো মেয়েও অবাক হয়ে গিয়েছিল, সুজিতের কাছে সরে এসে চাপা গলায় প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি?

—চুপ করুন, এখুনি জেগে উঠবে।

ফকির ঠিক সেইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করলে, কে জেগে উঠবে? আপনার বন্ধু কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছেন নাকি?

—ওই তো বিদঘুটে রোগ। সুজিত গম্ভীরভাবে বললে।

মঞ্জু বললে, তা জাগিয়ে দিন না। রোগ সেরে যাবে।

সুজিত মুখ-চোখে একটা আতঙ্কের ভাব এনে বললে, সর্ব্বনাশ! জাগিয়ে দিলে আর রক্ষে আছে। জেগে উঠলেই একেবারে অজ্ঞান —আর জ্ঞান হবে না। তাইতো পিছনে পিছনে থেকে সাবধানে পাহারা দিতে হয়।

—কিন্তু···ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হঠাৎ কিচেনে······

—কিচেনে ঢুকেছিলেন আমাদের সৌভাগ্য! ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কোথায় না যেতে পারে—কিছু বলবার তো জো নেই। বললেই জেগে উঠবে আর জেগে উঠলেই জ্ঞান থাকবে না।

—এ রোগ ওঁর কত দিন? মঞ্জুর কথার ভঙ্গীতে এবার যেন একটু সন্দেহের খোঁচা।

সুজিত বললে, তা অনেক দিনের। কেন বলুন তো? আপনি কোন ওষুধ টষুধ জানেন নাকি?

—এখন না জানলেও আশা করি ভেবে একটা কিছু বা'র করতে পারবো।

—আপনার কাছে তা হ'লে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আচ্ছা নমস্কার। দেখি আবার কোথায় গেল।

সুজিত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

মঞ্জু কতকটা নিজের মনেই বললে, হুঁ, রোগ বেশ কঠিন বলেই মনে হচ্ছে।

উপরে এসে ঘরে ঢুকে সুজিত দরজা বন্ধ করলে। ফকির আগেই এসে বিছানার উপর গালে হাত দিয়ে বসেছিল। সুজিতকে দেখেই সে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠলো: সারাদিন, সারারাত উপবাস। তুমি বলো কি। আমি কাল সকালেই চলে যাব। আর একদণ্ড নয়।

সুজিতও উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল, ভাবনাও জাগছিল নানা রকম। বিশেষ বিনোদবাবুর আসবার কথাটা শোনবার পর থেকে। বিছানার উপর ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে সুজিত বললে: এখন প্রস্তাবটা তোমার মন্দ ঠেকছে না ফকিরচাঁদ।

—তা হ'লে তুমি যাবে? ফকির উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

সুজিত বললে, থাকবার সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না। বিনোদবাবু কাল সকালেই আসছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎটা তেমন প্রীতিকর হবে কি?

নাঃ, যাওয়াই ভালো ফকিরচাঁদ। তবে কি জানো···না, থাক্।

সুজিত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপবার চেষ্টা করলো।

সকাল বেলা। ট্রেন এসে থেমেছে একটা বড় ষ্টেশনে।

ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় নটবর লাহিড়ী এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে মানে, গত রাত্রে অত্যধিক তরল পদার্থ সেবনের ফলে এখন দিন না রাত সেটুকু পর্য্যন্ত বোঝবার ক্ষমতা তাদের নেই।

নটবর লাহিড়ী ঘুমোচ্ছিল নিচের ব্যাঙ্কে। একজন টিকিট চেকার উঠে কামরার অবস্থা দেখে কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর নটবর লাহিড়ীর কাছে গিয়ে ডাকলো: ও মশাই উঠুন না, দয়া করে টিকিট্‌টা দেখান।

নটবর একবার আরক্ত চোখ মেলে চাইলো বটে, কিন্তু তখনই আবার পাশ ফিরে শুতে শুতে বললে: যান, যান, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করবেন না! টিকিট! টিকিট আবার কিসের? সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে।

উপরের ব্যাঙ্ক থেকে নটবরের একজন সঙ্গী জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো: বুকিং Closed মশাই; ফুল হাউস। নটবর লাহিড়ী স্বয়ং থিয়েটারে নামছে। তিনদিন আগে টিকিট কিনে রাখেননি কেন?

টিকিট কালেকটার চটে উঠলো: বাজে বকছেন কেন মশাই? কি নটবর লাহিড়ী দেখাচ্ছেন? আপনাদের রেলের টিকিট বা'র করুন।

—রেলের টিকিট! oh I see। নটবর এবার পকেট হাতড়ে টিকিট বার করলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে: কিন্তু রেলের টিকিট একেবারে রংপুরে গিয়ে দেখালে হবে না?

রংপুর। টিকিট-চেকার আশ্চর্য্য হয়ে বললে, রংপুর তো কাল ছেড়ে এসেছেন।

নটবর বোধহয় কথাটার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করলে না, বললে, ছেড়ে এসেছি বলে কি আর দেখা পাব না। একি কাজের কথা হোলো। My dear checker, are you the chancellar of the Excbequer !

নটবরের মুখ দিয়ে তখনও ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। চেকার ধমকে উঠলো, মাতলামি রাখুন। এতো সব রংপুরের টিকিট। আপনাদের সব excess fair with fine লাগবে।

উপরের ব্যাঙ্কের লোকটি শেকল ধরে টলতে টলতে কোন রকমে নিচে নেমে এলো। তারপর চেকারকে বললে, excess fair কেন ? জুচ্চুরী পেয়েছ বাবা ? চাই না আমরা এমন ট্রেণে চড়তে, আমাদের যেখান থেকে এনেছে সেইখানে পৌঁছে দাও, ব্যস্।

চেকার বললে, চালাকী রাখুন মশাই। গোলমাল করলে এখুনি পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিতে পারি জানেন ?

নটবরের দলের আর একজন এতক্ষণ নির্ব্বিকার চিত্তে ঘুমুচ্ছিল, পুলিস কথাটা কানে যেতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসলো…চেকারের মুখের দিকে টকটকে রাঙা দুটি চোখ মেলে চাইলো কিছুক্ষণের জন্য… কি বুঝলে সেই জানে, হঠাৎ উঠে পড়ে দৌড় দিলে দরজা লক্ষ্য করে…

চেকার তাকে ধরে ফেললে।

—পালাচ্ছেন কোথায় ? excess fair-এর টাকা কে দেবে ?

লোকটা বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে মণিব্যাগ বার করে বললে : আমি দিচ্ছি বাবা, আমি দিচ্ছি। যা তোমার ধর্ম্মে হয় কেটে নাও, পুলিস ডেক না।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ফকির দেখলো সুজিত তার বিছানায় নেই, মুখ শুকিয়ে উঠলো ফকিরের। তাড়াতাড়ি জামাটা

গায়ে দিয়ে নিচে নেমে এলো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সুজিত বাগানের দিকে গেছে। বাড়ীর সংলগ্ন মস্ত বাগান, ফকির তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটলো। সুজিতকে আবিষ্কার করে বললে, বেশ লোক তো তুমি? আমি ঘুম থেকে উঠে তোমায় চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি দিব্যি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছ? এখন বাগানে বেড়াবার সময়।

—অতি প্রশস্ত সময় ফকিরচাঁদ। সুজিত হাসতে হাসতে বললে: প্রাতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের মত স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী আর কিছু নেই।

ফকির বললে, কাল থেকে সারাদিন রাত আমি প্রায় বায়ু সেবন করেই আছি, সে খেয়াল আছে? আজ সকালে না আমাদের পালাবার কথা?

—হুঁ, তাই তো ভাবছি।

—এখনও ভাবছো? আর ভাববার সময় আছে? তোমার বিনোদবাবু কখন আসছেন?

—তাই তো ভাবছি।...আচ্ছা ধরো, বিনোদবাবু তো কোন কারণে নাও আসতে পারেন। পৃথিবীতে নিত্য কতরকম ঘটনাই ঘটছে—ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত, ট্রেণ দুর্ঘটনা, নিদেন পক্ষে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে যাওয়া—তুমি বলতে চাও বিনোদবাবু—ভগবান না করুন, একটা কিছুও হবে না?

সুজিতের কথাবার্ত্তা এবং ভাবগতিক দেখে মনে হোলো না যে তার যাবার কোন রকম তাড়া আছে। ফকির চটে উঠে বললে, জানি না আমি—তুমি তা হলে যাবে না, আমি বুঝতে পারছি....

বলতে বলতেই দেখলো রায়বাহাদুর এই দিকেই আসছেন; ফকির বললে, আর যাওয়া হয়েছে! ওই যে তোমার রায়বাহাদুর এই দিকেই আসছেন। একটা কেলেঙ্কারী না হয়ে আর যায় না! বলে সে সরে পড়লো।

রায়বাহাদুর কাছাকাছি এসে বললেন, এই যে ডাক্তার রায়! আপনারও বুঝি প্রাতঃভ্রমণের বাতিক আছে।

সুজিত বললে, আজ্ঞে ভ্রমণটাই আমার একটা বাতিক, তা সকালই কি আর মধ্যাহ্নই কি!

রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন, যত আলাপ হচ্ছে ততই আপনাকে আমার বড় ভাল লাগছে। আপনি যে অত বড় আমেরিকা ফেরত ডেন্টিষ্ট তা মনেই হয় না।

সুজিত একটু খটকায় পড়লো। লোকটা কি সন্দেহ করছে নাকি? নাঃ, মুখ দেখে তা মনে হয় না। সুজিত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, তা আপনার মনে করবার দরকার কি! মনে করুন না, আমি কেউ নয়, একটা বাউণ্ডুলে ভবঘুরে।

—কি যে বলছেন? না, না, আমি তা বলছিনে, কিন্তু আপনার অমায়িক ব্যবহারে আমি সত্যিই মুগ্ধ। আর দেখুন, একটা কথা কাল থেকে আমি আপনাকে বলি বলি মনে করেও বলতে পারছি না।

কি কথা? সুজিতের মুখের ধার করা হাসির ওপর ভাবনার ছায়া পড়লো। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষনেই সে হাসতে হাসতে বললে, যা বলবার বলে ফেলুন। আমার সব রকম কথাই গা সওয়া আছে। এখন না বললে আর হয়ত বলবার সময় নাও পেতে পারেন।

—সে কি কথা! আপনি তো কন্‌ফারেন্সের পর কয়েক দিন থেকে যাবেন বলেছিলেন। জরুরী কোন দরকার পড়েছে নাকি?

মনে মনে বিনোদকে কল্পনা করলে সুজিত, তারপর বললে, না, এখনও ঠিক পড়েনি, তবে বলা যায় না। যে কোন মুহূর্ত্তে পড়ে যেতে পাড়ে।

—সেটা কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা হ'বে ডাঃ রায়। আমরা বিশেষ ভাবে আশা করে আছি যে আপনার সঙ্গ আমরা কিছু দিন পাব।

সুজিত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আপনাদের নিরাশ করতে আমিও মনে ব্যথা পাব। তবে সবই নির্ভর করছে ঘটনার ওপর —কিম্বা দুর্ঘটনার ওপরও বলতে পারেন।

রায়বাহাদুর কথাটা বুঝতে পারলেন না। ভারি ধোঁয়াটে কথা ডাক্তারের। তিনি সবিস্ময়ে সুজিতের মুখের দিকে চাইলেন।

সুজিত বললে, সত্যি কথা বলতে কি, আমি একটা দুর্ঘটনার জন্যেই অপেক্ষা করছি—মারাত্মক না হোক, একটা ছোটখাট দুর্ঘটনা।

রায়বাহাদুর বিস্ময় আর চাপতে পারলেন না, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আবার জ্যোতিষ-টোতিষেও বিশ্বাস করেন নাকি? দুর্ঘটনা ঘটবে কি না আগে থেকে কেউ বলতে পারে?

—ঘটবে না তাই বা কে বলতে পারে!

পরম দার্শনিকের মত উদার একটা ভাব নিয়ে সুজিত চলে এলো সেখান থেকে।

হলঘরে পৌঁছে সুজিত দেখলো, মঞ্জু কাঠের সিঁড়ির রেলিংএর মাথা থেকে সড়াৎ করে গড়িয়ে একেবারে নিচে নেমে এলো। এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস। জায়গাটা নিরিবিলি থাকলেই সে এই ভাবে উপর থেকে নিচে নামবার কসরৎ করে। আজও নিরিবিলি ভেবেই রেলিং দিয়ে নেমেছিল। কিন্তু নেমে এসে দেখলো সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে সুজিত তার দিকে চেয়ে হাসছে! চমকে উঠলো মঞ্জু, রাগও হোলো একটু।

মঞ্জু উঠে দাঁড়াতেই সুজিত বললে, প্রাতঃ প্রণাম।

মঞ্জু কোন রকমে একটা প্রতিনমস্কার জানাল বটে, কিন্তু কথা কইলো না।

সুজিত নিজেই মৌনভঙ্গের চেষ্টা করলো: সিঁড়ির রেলিং জিনিষটার সার্থকতা এতদিনে বুঝতে পারলাম। এর আগে ওটাকে বিপদের বেড়া বলেই জানতাম।

মঞ্জু এবারও কোন কথা বললো না, বরং চলে যেতে উদ্যত হল।

সুজিত পিছন থেকে ডাকলে, শুনুন—

মঞ্জু ঘুরে দাঁড়াল চোখ মুখে বিরক্তির ভাব নিয়ে।

সুজিত বললে, আপনাকে একটা আনন্দ সংবাদ দিচ্ছি।

—আপনি ডাক্তার রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তো ?

—হ্যাঁ, আমার মস্ত একটা ত্রুটি হয়ে গেছে। তাঁকে সঙ্গে করে কাল আমার আসবার কথা ছিল—

সুজিত দু' নম্বর ছাড়লো : তিনি তো সেই দুঃখই করছিলেন ; দুঃখ কেন, অভিমানও বলতে পারেন। চলে যাবার সময় সেই কথাই বলে গেলেন—

বিস্ময়ের আতিশয্যে বিনোদের বাটার ফ্লাই গোঁফটা প্রায় আধ-ইঞ্চি উপরে উঠে গেল।

—তিনি চলে গেলেন নাকি ? কই, মিস্ চ্যাটার্জ্জী তো বললেন না।

—বলতে বোধ হয় তিনি লজ্জা পেলেন। ডাক্তার রায়ের যাওয়াটা একটু আকস্মিক কি না।

—সে কি। কনফারেন্সে তিনি থাকবেন না নাকি ? কি হল কি ?

—কি যে হল ঠিক বলতে পারবো না। কিন্তু তিনি তো চলে গেলেন।

—কোথায় চলে গেলেন ? আর আসবেন না নাকি ?

—দেখে শুনে তো সেই রকমই মনে হ'ল।

বিনোদ ধপ্ করে একটা সোফার উপর বসে পড়লো। গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে বললে, এখন উপায় ? রায় বাহাদুর কি করলেন ? তিনি যেতে দিলেন কি বলে ?

সুজিত তিন নম্বর ছাড়লে : আমরাও তো তাই বলি। যেতে দেওয়া কোন রকমেই উচিত হয় নি। বিশেষ ও রকম রাগারাগির পর।

—রায়বাহাদুরের সঙ্গে ডাক্তার রায়ের রাগারাগি ? কি বলছেন কি ? বিনোদ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল।

—বলাটা অবশ্য আমার উচিত নয়—সুজিত হাত কচলাতে কচলাতে বলে চললো : তবে রায়বাহাদুরের পক্ষেও কাজটা ভাল হয় নি।

বিনোদ ক্ষেপে উঠলো : আমি রায়বাহাদুরের সঙ্গে এখুনি দেখা করে বলছি। তিনি তো এরকম ছিলেন না। অতবড় মাননীয় অতিথির সঙ্গে এই ব্যবহার।

—সেই তো কথা! কিন্তু রায়বাহাদুরের সঙ্গে আপনার দেখা করাটা এখন বোধ হয় উচিত হবে না।

—কেন?

—কাজটা করে ফেলে তিনি একেবারে মরমে মরে আছেন। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা আর তা'কে দেবেন না। কোন রকমে তিনি এখন ডাক্তার রায়কে ফিরিয়ে আনবার জন্যে ব্যাকুল। আপনি চেষ্টা করলে বোধ হয় পারেন।

—কিন্তু ফিরিয়ে আনব কোথা থেকে! কোথায় তিনি গেছেন তাও জানি না। এক আমি ছাড়া এখানে তিনি কাউকে তো চেনেনও না।

—তা হ'লে আপনার কাছেই গেছেন হয় তো। আপনিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা বিনোদবাবু।

বিনোদ বিস্মিত হয়েছিলো, উত্তেজিত হয়েছিলো, ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলো, এবার অভিভূত হ'লো। শাদা-সিধে লোক, কাজ-পাগলা মানুষ, ডাক্তার রায়কে সম্মিলনীতে হাজির করতে পারলে পাঁচজনের তারিফ পাবার আশা আছে, না আনতে পারলে পাঁচজনের কাছে ছোট হ'তে হবে। বিনোদ তখুনি রাজী হয়ে বললে, বেশ, আমি চললাম। যদি ফিরিয়ে আনতে পারি তো রায়বাহাদুরকে আমি একবার দেখবো। এখন আমি কিছু বলছি না—হাত পা নাড়ার আতিশয্যে বিনোদের কাঁধের চাদরটা কোটের ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিলো, সেটাকে যথাস্থানে স্থাপিত করে বিনোদ যাবার জন্যে পা বাড়াল।

ঠিক সেই সময় রায়বাহাদুর সেখানে হাজির হলেন।

—এই যে বিনোদ।

বিনোদ গম্ভীর মুখে বললেন, আপনাকে এখন কিছু বলতে চাইনা রায়বাহাদুর।

এখন কিছু না বলবার কারণ কি হ'তে পারে রায়বাহাদুর তার কিছুই অনুমান করতে পারলেন না। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, সে কি হে? চললে কোথায়?

'—এখন কিছু বলতে চাই না।' বলতে বলতে বিনোদ বেরিয়ে গেল উত্তেজিত ভাবে।

রায়বাহাদুর সুজিতে দিকে চেয়ে বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো? বুঝতে পারছিনা কিছু।

সুজিত হাসতে হাসতে বললে, বুঝবার আর কি আছে রায়বাহাদুর। বিনোদবাবু চিরকালই কি-যেন একরকম।

পূর্ণিমা থিয়েটারের সাজঘর। জন দুই ড্রেসার মিলে ডাক্তার রায়কে ইন্দ্রজিতের পোষাক পরাচ্ছে; চেলীর কাপড়, জরিদার বেনিয়ান, মাথায় জরিদার পাগড়ি, কোমরে তলোয়ার···কিছুই বাদ যায় নি। মেকআপ ম্যান মুখে রং মাখিয়ে, ঠোঁটের উপর একজোড়া গোঁফ বসিয়ে তার কর্ত্তব্য পালন করেছে। ফ্যালারাম ডাক্তারকে পাঠ মুখস্থ করাবার জন্যে খাতা হাতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার রায় কিছুতেই রং মেখে সং সাজতে রাজী হচ্ছিলেন না, তাঁকে প্রায় ধরে-বেঁধে সাজান হয়েছে।

সাজ পোষাক শেষ হবার পর ড্রেসার বললে, আয়নায় চেহারাখানা একবার দেখুন স্যার—ঠিক কলকেত্তার মতো হলো কিনা বলুন।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে ডাক্তারের কান্না পেতে লাগলো। তিনি বললেন, এই পোষাক পরে কি করে বা'র হব?

ম্যানেজার নকড়ি বললেন, কেন পোষাকটা খারাপ কিসের? কলকাতায় কি এমন সাচ্চা জরির পোষাক পরতেন? ওসব চাল এখানে দেখাবেন না মশাই।

ফ্যালারাম বললে, নিন, নিন, আপনার পার্টটা আর একবার ঝালিয়ে নিন।

ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ ভাল করে পড়িয়ে দাও ফ্যালারাম, আর সময় নেই। আমি ষ্টেজটা দেখে আসি ততক্ষণ। ড্রপ উঠে গেল।

নকড়ি উঠে গেলেন, ড্রেসার এবং মেক-আপ্ ম্যানও গেল তাঁর পিছনে পিছনে।

ফ্যালারাম বললে, শুনুন, হিরোইন মানে ইন্দ্রজিৎ-পত্নীর গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রবেশ।

—প্রবেশের পরেই একটা মূর্চ্ছা হয় না? প্রশ্ন করে ডাক্তার করুণভাবে চাইলেন ফ্যালারামের দিকে।

ফ্যালারাম বললে, মূর্চ্ছা কি মশাই? অত বড় বীর ইন্দ্রজিৎ, রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। সে অন্দরমহলে ঢুকে মূর্চ্ছা যাবে কেন?

—নাঃ, ভাবছিলাম তা হলে আর বেশী হাঙ্গামা থাকে না।

ফ্যালারাম গরম হয়ে উঠলো: আপনার চালাকী রেখে দিন, শুনুন: হিরোইন আপনাকে দেখে বলবে—

তবু ভাল, মনে তব পড়িয়াছে এতক্ষণে
দাসীরে তোমার, কিন্তু নাথ, রণসাজ
সাজে কি হেথায়, কত মধুরাতি যেথা
কাটায়েছ কুসুম-বাসরে।

ডাক্তার চোখ কপালে তুলে বললেন, এ্যাঁ।

এ্যাঁ নয়, আপনি বলবেন:

বাসর যাপিতে নয়, আসিয়াছি লইতে
বিদায়! বীরের প্রেয়সী তুমি,
রণসাজে আশঙ্কা কি হেতু?

নিন, বলুন।

ডাক্তার রায় অসহায় ভাবে বলে উঠলেন, ওই অত কথা বলতে হবে? কবিতা যে আমার মুখস্থ হয় না।

ফ্যালারাম খাতাখানা ছুঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে উঠলো, এই রইল তা হলে আপনার পার্ট। আমার দ্বারা হবে না। আমি যাচ্ছি ম্যানেজারের কাছে।

ফ্যালারাম বেরিয়ে গেল। ডাক্তার রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন। এই বিচিত্র পোষাকে লোকের সামনে বেরতে হবে? তার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। ভাবতে ভাবতে তিনি মন ঠিক করে ফেললেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, ডাক্তার রায় সাজঘর থেকে বেরিয়ে চোরের মত পা টিপে টিপে ষ্টেজের পিছন দিকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ষ্টেজের ওপর তখন সখীগণ পরিবেষ্টিতা ইন্দ্রজিৎ-পত্নী গান গাইছে আর সখীরা গানের সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ না রেখে ধূলো উড়িয়ে দুম দাম শব্দে নাচছে। ম্যানেজার উইংসের পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একান্ত আগ্রহ ভরে এই নৃত্যগীত উপভোগ করছিলেন, ফ্যালারাম তাঁর কাছে এসে বললে, ঢের ঢের বেয়াড়া এক্টর দেখেছি মশাই, আপনার নটবর লাহিড়ীর জুড়ি দেখি নি। ওকে পার্ট পড়ান আমার কর্ম্ম নয়। ম্যানেজার উইংস ছেড়ে ভিতর দিকে পিছিয়ে গেলেন, তারপর বললেন, আরে ওসব চালাকী ওদের দস্তুর। ষ্টেজে বেরিয়ে ঠিক সিধে হয়ে যাবে দেখো। খালি নজর রেখো যেন পালাতে না পারে।

ফ্যালারাম বললে, না পালাবে কোথায়? বাইরের সব দরজায় পাহারা।

নকড়ি বললে, ঠিক আছে। চলো এইবার নিয়ে আসি—আর দেরী নেই। এই নাচের পরই তো ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।

ফ্যালারামকে নিয়ে নকড়ি এলেন সাজঘরের সামনে; বাইরে থেকে হাঁক দিলেন, আসুন লাহিড়ী মশাই সময় হয়েছে।

ভেতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন, পিছনে ফ্যালারাম। কিন্তু ঘরের ভেতর কারও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ম্যানেজার টাকের উপর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, গেল কোথায়!

ফ্যালারাম বললে, এই খানিক আগেই তো ছিল।

—হুঁঃ, যত সব—

বিরক্তি সূচক একটা শব্দ করে নকড়ি প্রায় ছুটতে ছুটতে সাজঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কর্ম্মচারীদের একজন সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, নকড়ি জিজ্ঞাসা করলেন: লাহিড়ী মশাইকে দেখেছ? নটবর লাহিড়ী?

—আজ্ঞে না।

—আজ্ঞে না! নকড়ি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চেঁচাতে সুরু করলেন: তা হলে জল-জ্যান্ত লোকটা গেল কোথায়, হাওয়ায় উবে গেল? বাইরের দরজায় কে পাহারায় ছিল।

লোকটি বললে, আজ্ঞে, আমিই ছিলাম। সেখান দিয়ে মাছিটি পর্য্যন্ত গলে যায় নি।

—তা হ'লে আমার সর্ব্বনাশ করে লোকটা গেল কোথায়?

ম্যানেজার পাগলের মতো চারিদিকে ছুটোছুটি সুরু করে দিলেন। নটবর লাহিড়ীকে ষ্টেজে হাজির করতে না পারলে বিশ বছরের ম্যানেজারীর গর্ব্ব ধূলিসাৎ হবে, মুখে চূণ-কালি মাখিয়ে ছাড়বে শহরের স্কুল-কলেজের ছেলেরা!

অন্য একদিকের উইংসের ফাঁকে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ এতক্ষণ বিস্ফারিত চোখে সখীদের নাচ দেখছিল। নকড়ি তাকে দেখতে পেয়েই সেখানে এসে হাজির হলেন।

—এই যে গোবিন্দ, বাবা গোবিন্দ, তোমার মনিবটি কোথায় বলতো বাবা?

গোবিন্দ ডাক্তার রায়ের অন্তর্দ্ধান কাহিনীর কিছুই জানতো না, বললে, জানি না তো। আমি নাচ দেখছিলাম, ফাষ্ট কেলাস নাচ—

—নাচ না আমার গুষ্টির পিণ্ডি। এই নাচের পরেই ইন্দ্রজিতের

প্রবেশ। লাহিড়ী মশাইকে খুঁজে না পেলে আমি যে দয়ে মজে যাব। সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

প্রম্পটার থেকে সীন-শিফটাররা পর্য্যন্ত সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ম্যানেজারের চারিদিকে। ম্যানেজার তাদের লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠলেন, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি? খোঁজ না সব আহম্মকের দল। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বার কর।

কর্ম্মচারীরা সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটলো।

ম্যানেজার ফ্যালারামের দিকে চাইলেন: তুমি যাও, উইংসের ফাঁক থেকে সখীদের ইসারা করে বলে দাও নাচটা চালিয়ে যেতে।

ফ্যালারাম বললে, নেচে নেচে পা ধরে যাবে যে!

ম্যানেজার হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বললেন, পা ধরে যায়, বসে বসে নাচবে, শুয়ে শুয়ে নাচবে—শুয়ে শুয়ে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেলে আবার উঠে নাচবে, ঘুরে ফিরে নাচবে, যতক্ষণ পারে নাচবে···

ফ্যালারাম ম্যানেজারের হুকুম তামিল করতে ছুটলো।

ডাক্তার রায়কে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে গোবিন্দ একটু মুষড়ে পড়েছিল। আহা, এমন জমাট নাচ-গান, শেষটা বুঝি সব মাটি হয়ে যায়। সেও এদিক ওদিক ঘুরে ডাক্তারের খোঁজ করতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লো ষ্টেজের পিছন দিকটায়। এখানে পুরোনো, ভাঙ্গা সিনের কাঠ স্তূপাকার করে রাখা। হঠাৎ গোবিন্দ তারি মধ্যে আবিষ্কার করলো ডাক্তার রায়ের মুখ। ডাক্তার রায় ভাঙ্গা কাঠগুলোর মধ্যে আত্মগোপন করে, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে হঠাৎ বোধ হয় মুখটা একবার বার করেছিলেন, গোবিন্দ সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁকে দেখে ফেললো, বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে ডাকলে, স্যার! ডাক্তার রায় হাত নেড়ে তাকে নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে যেতে ইসারা করলেন। গোবিন্দ ইসারার মর্ম্মোদ্ধার করতে না পেরে হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। ডাক্তার রায়ের মাথার রক্ত গরম হয়ে

উঠেছিল। তিনি ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে গোবিন্দকে চুপ করে থাকতে বললেন।

তাতেও কোন কাজ হোলো না।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে, এখানে ঢুকেছেন কেন স্যার?

ডাক্তার রায় চাপাগলায় গর্জ্জাতে লাগলেন: ঢুকেছি আমার খুশী। তুমি এখান থেকে যাও দেখি আহম্মক।

গোবিন্দ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, আজ্ঞে যাচ্ছি। কিন্তু আপনার থ্যাটার তো ষ্টেজের পিছন দিকে নয়, সামনের দিকে।

—আমি জানি। তুমি যাও।

—ভুলে এসে পড়েছেন বুঝি?

ডাক্তার রায়ের ইচ্ছা হোলো একখণ্ড কাঠ তুলে গোবিন্দর মাথায় বসিয়ে দিয়ে তাকে চিরকালের মত চুপ করিয়ে দেন। কিন্তু ইচ্ছা হোলো মাত্র। ও-রকম মারাত্মক কিছুই তিনি করে উঠ্তে পারলেন না। তার বদলে খানিকটা সংযত হয়ে বললেন, না, আমি একটা জিনিস খুঁজছি।

—কি খুঁজছেন স্যার? আমি খুঁজে দেব? গোবিন্দ উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

ডাক্তার রায় দাঁতে দাঁতে ঘষতে ঘষতে বললেন, না, না, না। বলছি তোমায় খুঁজতে হবে না; তুমি যাও। দয়া করে যাও।

গোবিন্দকে তবু নিরস্ত করা গেল না, সে বললে, টর্চ্চ আনব স্যার? ম্যানেজারকে ডেকে আনবো?

কী বিপদ! এমন মুস্কিলে মানুষ পড়ে! তাও আবার নিজের সহকারীর জন্যে! ডাক্তার রায় অসহায় কণ্ঠে বললেন, কাউকে ডাকতে হবে না, দোহাই গোবিন্দ, তুমি যাও—

কিন্তু স্যার······

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে গোবিন্দ যাবার জন্যে দু'পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু যেতে হোলো না। ম্যানেজার নকড়ি ফ্যালারামকে নিয়ে এই

দিকেই আসছিলেন। গোবিন্দকে দেখতে পেয়ে বললেন, কি হে গোবিন্দ? পিছু ফিরে হাঁটা অভ্যাস করছো নাকি?

...আজ্ঞে না—দেখছিলাম।—গোবিন্দ গোটা দুই ঢোক গিললে।

ম্যানেজারের সন্দেহ হোলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখছিলে?

—স্যারের ওখানে কিছু হারিয়েছে কি না।

—স্যার মানে তোমার মনিব! ওই ভাঙ্গা সিনগুলোর পিছনে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি কি খুঁজছেন।

ম্যানেজার সদর্পে কাঠের স্তূপের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, এইবার খুঁজে বার করাচ্ছি।

ডাক্তার রায়কে খুঁজে পেতে এরপর দেরী হোলো না।

ম্যানেজার চীৎকার করে উঠলেন, আপনার কি রকম আক্কেল বলুন তো মশাই? আপনার জন্যে থিয়েটার মাটি হয়ে যেতে বসেছে, আর আপনি এখানে লুকিয়ে বসে আছেন?

ডাক্তার সেইখান থেকেই বললেন, লুকিয়ে? কে বললে লুকিয়ে? আমি...এই...এদিকটা একটু দেখছিলাম—

—আমরা এদিক ওদিক অনেকদিক দেখে রেখেছি মশাই, আপনি বেরিয়ে আসুন দেখি, নইলে কলকাতার এক্টর বলে মান আর রাখতে পারবো না।

অগত্যা ডাক্তার রায়কে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হোলো।

ডাক্তার রায় যখন সেই ভাঙ্গা কাঠের স্তূপে বসেছিলেন, তখন একরাশ পিঁপড়ে বিনাবাধায় তাঁর জামার ওপর উঠে বসেছিল, জরিদার পাগড়ী, চেলীর কাপড়েও ঢুকেছিল দু'চারটে। উত্তেজনার আতিশয্যে ডাক্তার রায় সেটা খেয়ালই করেননি। তিনি বেরিয়ে আসতেই নকড়ি আর ফ্যালারাম তাঁকে প্রায় বন্দী করে ষ্টেজের দিকে নিয়ে চললো।

এদিকে পূর্ণিমা থিয়েটারের গেটে ততক্ষণে একটা গাড়ী এসে থেমেছে। গাড়ী থেকে নামলো নটবর লাহিড়ী আর তার দুইজন

বন্ধু। গাড়ীভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নটবর বন্ধুদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলে, ওহে এইটেই তো পূর্ণিমা থিয়েটার ?

বন্ধু বললে, সাইনবোর্ড আর প্ল্যাকার্ডের ভিড় দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। ঢুকে পড় দুর্গানাম করে।

—কিন্তু প্লে ত আরম্ভ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

নটবর লাহিড়ী আবার কবে সময়মত প্লে করতে নেমেছে। তুমি যে সশরীরে এসেছ এই তো ওদের ভাগ্যি।

—তোমরাও এসো না সঙ্গে।

—না, না, তুমি বরং একাই যাও। আমরা বাইরে আছি।

নটবর একাই থিয়েটারের ভিতর ঢুকলো।

ষ্টেজের উপর নাচগান শেষ হয়ে গেছে, কুসুমিকা ইন্দ্রজিতের জন্যে অপেক্ষা করছে। কলকাতার স্বনামধন্য নটবর লাহিড়ীকে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে দর্শকরা অডিটোরিয়মে রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

উইংসের পাশে ম্যানেজার আর ফ্যালারাম তখন ডাক্তার রায়কে ঠেলে ষ্টেজে পাঠাবার চেষ্টা করছে। ম্যানেজার যতই বলেন, যান না মশাই, এইবার ঢুকুন। ডাক্তার ততই বলেন, এই যে যাই।

কিন্তু যেতে গিয়ে পা আর সরে না। অনেকটা বলিদানের পাঁঠার মত অবস্থা। এর চেয়ে মুস্কিল হয়েছে পাগড়ীটা নিয়ে। কখন যে সেটা মাথা থেকে খুলে হাতে নিয়েছিলেন সেটা ডাক্তার রায়ের খেয়ালই ছিল না। এখন হাত থেকে সেটা কোথায় রাখেন সেই ভাবনাতেই তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। ওটা যে আবার মাথাতেই পরা যায় সেটা আর মনেই নেই। বিব্রত হয়ে তিনি পাগড়ীটা একবার সোজা ম্যানেজারের হাতেই তুলে দিলেন, উত্যক্ত ম্যানেজার আরও উত্যক্ত হয়ে সেটা তাকে ফেরৎ দিতে দিতে বললেন, আপনি খেলা সুরু করলেন যে! শেষে কি আপনাকে ধাক্কা মেরে পাঠাতে হবে ?

ডাক্তার বললেন, না, না, এই যে যাই—

তাড়াতাড়িতে পাগড়ীটা গোবিন্দর হাতে দিয়ে তিনি চোখ কাণ

বুঁজে ষ্টেজের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, কিন্তু দু'পার বেশী এগোতে পারলেন না। অডিটোরিয়াম-ভর্ত্তি অসংখ্য মাথা ষ্টেজের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে, ডাক্তার রায়ের বুকের ভেতর হাতুরি পেটার আওয়াজ হ'তে লাগলো। কুসুমিকা পর্য্যন্ত অসস্তি বোধ করতে লাগলো, মনে মনে মুণ্ডপাত করলো ডাক্তারের। কিন্তু ডাক্তারের তখন সে কথা ভাববার অবস্থা নয়। আবার ভিতরে ঢুকে পড়া যায় কি না দেখবার জন্যে তিনি উইংসের দিকে চাইলেন। দেখা গেল, পাগড়ীটা গোবিন্দর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ম্যানেজার ক্রোধে ক্ষোভে প্রায় উর্দ্ধবাহু হয়ে নৃত্য করছেন। আর বলছেন: দেখেছ—এটা আবার ফেলে গেল?

—এই যে দিয়ে আসছি স্যার! বলেই গোবিন্দ নকড়িকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে পাগড়ীটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ষ্টেজে ঢুকে পড়লো, কেউ বাধা দেবার সময় পর্য্যন্ত পেল না।

ষ্টেজের উপর কুসুমিকা দেখলো যে আর অপেক্ষা করা যায় না, সে নিজেই ইন্দ্রজিৎ-বেশী ডাক্তারের দিকে এগোতে লাগলো এবং ঠিক সেই সময় পাগড়ী হস্তে আবির্ভাব হলো গোবিন্দর। একেবারে খাঁটি পৌরাণিক নাটক, তারই মাঝে মালকোঁচা-মারা কাপড় আর হাফসার্ট-পরা গোবিন্দ এসে পাগড়ীটা ইন্দ্রজিতের হাতে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ভিতরে ঢুকে গেল। দর্শকদের আসন থেকে হাসির ফোয়ারা ছুটলো, কেউ কেউ শিস দিতে লাগলো, কুসুমিকার মুখ পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

দর্শকদের হাসির ঢেউ একটু কমতে কুসুমিকা ওরফে ইন্দ্রজিৎ-পত্নী ডাক্তার রায়ের সামনে গিয়ে বলতে সুরু করলো:

তবু ভাল, এতক্ষণে মনে তব পড়িয়াছে
দাসীরে তোমার! কিন্তু নাথ, রণসাজ
সাজে কি হেথায়?

ডাক্তার রায় কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, কুসুমিকার কথা শেষ হবার আগেই তিনি বলে ফেললেন: আমি এসেছি।

তাঁর এই আগমন-ঘোষণার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না, না দর্শকরা, না কুসুমিকা, বোধ হয় ডাক্তার রায় নিজেও না। কুসুমিকা একটা তীব্র দৃষ্টি হানলে ডাক্তারের দিকে, তারপর চাপা গলায় বললে : একি! পার্ট ভুলে গেছেন নাকি?

পার্ট তো পার্ট, ডাক্তার রায় নিজেকেই ভুলে যাবার উপক্রম করছিলেন, কারণ ভাঙ্গা কাঠের স্তূপ থেকে যে পিপীলিকাকুল প্রথমে তাঁর জামায় এবং পরে জামার মারফতে দেহের বিভিন্ন অংশে শত্রু-সেনার মত অনুপ্রবেশ করেছিল, তারা এই সময় সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ সুরু করে দেওয়ায় তাঁর আর কিছু ভাববার অবসর ছিল না। মনে হচ্ছিল, জামাটা গা থেকে খুলে ফেলে ষ্টেজের ওপরই তিনি শুয়ে পড়বেন। কিন্তু না, অতটা বিপর্যয় হ'লো না, কেবল হাত দুটো তাঁর কখনও জামার তলায়, কখনও কাণের পাশে, কখনও পায়ের কাছে ওঠা-নামা করতে লাগলো এবং সেই অবস্থাতেই তিনি আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন : আমি এসেছি, এসেছি···বিদায়!

দু একটি পিঁপড়ে ইতিমধ্যে তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশের চেষ্টা করছিল এবং কয়েকটা ঢুকে পড়েছিল দেহের নানা দুর্গম অংশে; ফলে ডাক্তার রায় 'বিদায়' কথাটি উচ্চারণ করেই লাফাতে সুরু করলেন।

কুসুমিকা ভয়ে দুহাত পিছিয়ে গেল। দর্শকদের হাসি আর হট্টগোলে কান পাতা দায় হয়ে উঠলো। ম্যানেজার নকড়িও উইংসের পাশে এতক্ষণ লাফাচ্ছিলেন—রাগে, এইবার তিনি চীৎকার করে উঠলেন : ড্রপ! ড্রপ! ড্রপ ফেলো।···

ড্রপ পড়তেই ম্যানেজার তীরবেগে ষ্টেজের ওপর এসে ডাক্তার রায়ের একটা হাত চেপে ধরে বললেন, মশাই, আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো?

ডাক্তার পিঁপড়ের আক্রমণ নিবারণের জন্যে শরীরের বিভিন্ন স্থানে থাবড়া মারতে মারতে বললেন, কিছু ভাবতে পারছি না মশাই, শুধু পিঁপড়ে।

পিঁপড়ে। ম্যানেজার কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন, পিঁপড়ে কি মশাই?

ডাক্তার রায় পোষাক খুলতে খুলতে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, লাল পিঁপড়ে—জামায়, কাপড়ে, কাণে···সর্ব্বাঙ্গে।

ম্যানেজার বিশ্বাস করলেন না, ডাক্তারের হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরে বললেন, চালাকী করবার আর জায়গা পান নি? কোথায় পিঁপড়ে।

ডাক্তার রায়ের গা থেকে কয়েকটা পিঁপড়ে ইতিমধ্যে নকড়ির গায়ে গিয়ে উঠেছিল, তাকেও তারা আক্রমণ সুরু করলে। ডাক্তার রায় আর কিছু বলবার আগেই দেখা গেল ম্যানেজারও পিঁপড়ের কামড় খেয়ে লাফাতে সুরু করেছেন।

ডাক্তার রায় আর দেরী না করে সেই গোলযোগের মধ্যে গোবিন্দকে নিয়ে অন্য দিক দিয়ে সরে পড়লেন।

মিনিটখানেক পরে ম্যানেজার দেখলেন, আসামী পালিয়েছে। তিনি ছুটলেন তার সন্ধানে।

নটবর লাহিড়ী আসছিল এইদিকে, ধাক্কা লাগলো দুজনের। নটবর বললে, কিছু যদি না মনে করেন একটা কথা বলি—

ম্যানেজার খিঁচিয়ে উঠলেন, মনে করবো না? বিলক্ষণ মনে করবো। সরে যান বলছি, আমার কোন কথা শোনবার সময় নেই।

নটবর বললে, আহা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি নটবর লাহিড়ীকে চান তো?

—আলবৎ চাই! এখন দেখতে পেলে বাছাধনকে বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল!

ম্যানেজার ধাক্কা দিয়ে নটবরকে সরিয়ে ছুটলো ডাক্তারের সন্ধানে। নটবরও ছুটলো তাঁর পিছনে।

অডিটোরিয়মে গণ্ডগোলের জন্য থিয়েটারের গেটে লোকজন কেউ ছিল না।

ডাক্তার রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বেরিয়ে এলেন। গোবিন্দ

পিছিয়ে পড়েছিল, ডাক্তার রায় বললেন, শিগগির, শিগগির গোবিন্দ। দেরী কোরো না, বেরিয়ে পড়।

গোবিন্দ বললে, আজ্ঞে দরজায় কেউ নেই যে।

—আহম্মক! দরজায় কেউ থাকলে বুঝি তোমার সুবিধে হ'ত।

নির্ব্বোধ গোবিন্দর জন্য নতুন করে বিপদে পড়বার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, তিনি গোবিন্দকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

রাস্তায় পা দেবার খানিক পড়েই একটা ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল। ডাক্তার রায় গোবিন্দকে নিয়ে উঠে বসলেন। গাড়ীওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে যাবেন কোথায়?

ডাক্তার রায় বললেন, যেখানে হোক নিয়ে চলো। না না, ডাক্তারখানায় চলো, যে কোন ডাক্তারখানায়।

কোচম্যানের চাবুক খেয়ে গাড়ির ঘোড়া ছুটো ছুটতে লাগলো।

এদিকে ম্যানেজার দলবল নিয়ে গেটের কাছে হাজির হ'লেন। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে ফ্যালারাম বললে, তারা পালিয়েছে।

—পালিয়েছে মানে? ম্যানেজার হাঁকতে লাগলেন: কোথায় পালাবে? আমি সারা শহর চষে ফেলব। আমি হুলিয়া বার করবো।

নটবর বললে, তার আগে অধমের একটা কথা শুনবেন?

ম্যানেজার খিঁচিয়ে উঠলেন: আমি মরছি আমার নিজের জ্বালায় আর আপনি কাণের কাছে এসে প্যান্ প্যান্ করছেন! ওহে তোমরা এই লোকটাকে এখান থেকে বার করে দিতে পার না?

দু'একজন নটবরের দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল, নটবর বললে, দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটু ধৈর্য্য ধর দিকি। আপনাদের নটবর লাহিড়ীকে পেলেই হোলো তো? আমি বলছি তিনি পালান নি।

—পালান নি! তিনি কোথায় তা হ'লে?

—সশরীরে এই আপনাদের সামনে। আমিই আসল নটবর

লাহিড়ী, আদি ও অকৃত্রিম। যিনি পালিয়েছেন তিনি জাল, নকল, ভেজাল।

নকড়ির মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ নটবরের দিকে চেয়ে থাকবার পর তিনি বললেন, আপনিই নটবর লাহিড়ী?···আরে হ্যাঁ, তাই তো যেন চেনা চেনা লাগছে। আরে কি আশ্চর্য্য···এতক্ষণ বলতে হয় মশাই!

নটবর হাসতে হাসতে বললে, এখানে আসবার পর সেই কথাই তো বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু শুনছে কে!

নকড়ি নটবরের দিক থেকে চোখ ফেরালেন না, বলতে লাগলেন: আরে তাইত! এই তো ঠিক নটবর লাহিড়ী, একেবারে হুবহু নটবর লাহিড়ী—ও ফ্যালারাম, এই তো আমাদের নটবর লাহিড়ী!

ফ্যালারাম বললে, আমার তো সেই ষ্টেশনেই ধোঁকা লেগেছিল। শুধু আপনার বোকামীতে এই গণ্ডগোল!

ম্যানেজার আবার চড়া সুর ধরলেন: আমার বোকামী! বিশ বছর থিয়েটার চালাচ্ছি, আমি এক্টর চিনি না বলতে চাস? দেখ্ ফ্যালা—

ফ্যালা ভড়কালো না, বেশ জোর গলাতেই বললে, কি ফ্যালা ফ্যালা করছেন। আমায় চোখ রাঙাবেন না বলছি। দিন আমার মাইনে চুকিয়ে, আমি এমন থিয়েটারে থাকতে চাই না।

ম্যানেজারের সুর পাল্টে গেল: আহা, রাগ করিস কেন! আমি তো বলছি আমার একটু ভুল হয়েছিল। কিন্তু এবার ঠিক চিনেছি, এ একেবারে আসল নটবর!

নটবরের হাত ধরে তিনি সাজঘরের দিকে নিয়ে গেলেন।

ডাক্তার রায় ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে নানা জায়গায় ঘুরলেন, কিন্তু পছন্দমত একটা ডাক্তারখানা খুঁজে পেলেন না। শেষটা গাড়িওয়ালা বিরক্ত হয়ে বললে, রাত তো অনেক হ'ল, আর কত ঘুরবো মশাই! ঘোড়াগুলোর যে জান যায়।

ডাক্তার রায় বললেন, একটা দাঁতের ডাক্তারখানা খুঁজে বার করলে হ'ত না ?

গাড়িওয়ালা বিরক্ত কণ্ঠে বললে, না মশাই না, আর পারবো না। আমার ভাড়া চুকিয়ে দিন।

—দেব বাবা দেব। তার আগে যদি রাত্তিরে থাকার মত একটা জায়গা—মানে কোন হোটেলে পৌঁছে দিতে পার ?

—হোটেলে যাবেন তো ডাক্তারখানা খুঁজছিলেন কেন ? ভ্যালা সওয়ারী জুটেছে !

বিরক্ত কোচম্যান অনিচ্ছুক ঘোড়া দুটোর পিঠে চাবুক হাঁকাতে লাগলো।

*

রায়বাহাদুর অধরনাথের বাড়ীর দোতলার ঘরে ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে সুজিত দাড়ি কামাচ্ছিল আর ফকিরচাঁদ দাঁড়িয়েছিল জানালার কাছে—উদাস চোখে বাইরের দিকে চেয়ে। কামান শেষ হ'তে সুজিত বললে, তা হ'লে আর একটা রাত কাটলো ফকিরচাঁদ !

ফকির বললে, কাটলো বৈ কি।

সুজিত বললে, এখন থেকে ঘরেই তোমার খাবার দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সুতরাং ক্ষুধা নিবারণ সম্বন্ধে তোমার অভিযোগ করবার আর কিছু নেই তো ?

—না।

—বড় সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছ। তুমি কি বৃথা বাক্যব্যয় আর করবে না ঠিক করেছ ?

—তুমি কি বলে এখানে থেকে গেলে বলো ত ? কোন্ সাহসে তুমি এখনও এখানে বসে আছ ? আজ বিকালে Conference.

তোমার সেখানে কি অবস্থা হবে ভেবেছ ? ভেবে দেখেছ আসল ডাক্তার রায়ের চেনা লোক কেউ থাকলে তোমার কি দুর্দ্দশা হবে? এখনও কি তোমার চৈতন্য হবে না ?

সুজিত একটু হাসলে, তারপর গম্ভীর মুখে বললে, সবই বুঝছি ফকিরচাঁদ, তবু মনে হচ্ছে, ভাগ্য কি নেহাৎ মিছিমিছি এই ভুলের জটটা পাকিয়ে তুলেছে ? এর মধ্যে কি একটা গভীর, মহৎ উদ্দেশ্যের আভাষ দেখতে পাচ্ছ না ; যার জন্যে সব বিপদ তুচ্ছ করা যায়।

—ভাগ্যের না হোক, তোমার উদ্দেশ্য অন্ততঃ দেখতে পাচ্ছি।

সত্যি দেখতে পেয়েছ ? ভাগ্যের এই রসিকতার ভেতর দিয়ে বেকার সমস্যার একটা কিনারার পথ তুমি দেখতে পাচ্ছ ? সুজিত উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠলো।

ফকির বললে, পাচ্ছি বইকি! রায়বাহাদুরের ওই ডাকাত মেয়েটির সঙ্গে তুমি প্রেমে পড়েছ। বেকার সমস্যার চেয়ে বিয়ের প্রতি আপাততঃ তোমার ঝোঁক একটু বেশী।

—আমার প্রতি তুমি একটু অবিচার করছো ফকিরচাঁদ। বিয়ে করে বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা বাংলা দেশের ছেলেদের একটা বিশেষত্ব বটে, কিন্তু আমি ঠিক সেকথা ভাবছি না। অবশ্য এ বিষয়ে রায়বাহাদুরের সঙ্গে আমার একটু আলাপ আলোচনা দরকার।

ফকির আর কিছু বলবার আগেই নিচে একটা কলরব শোনা গেল। ফকির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো লোকজন চারিদিকে ছুটোছুটি করছে, রায়বাহাদুর থেকে বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত জড় হয়েছে গেটের কাছে এবং সহিস গোছের একটা লোক দুরন্ত একটি ঘোড়ার মুখের লাগামটা টেনে ধরে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে।

ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে সুজিত আর ফকির দুজনেই তখন নিচে নেমে এলো।

বিব্রত বিচলিত রায়বাহাদুরের পাশে দাঁড়িয়ে রাজলক্ষ্মী দেবী বলছিলেন, তোমাকে কতবার বলেছি, মেয়েছেলেকে অত আদর

দেওয়া ভাল নয় দাদা। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে এই যে জন্মের মত খোঁড়া হয়ে থাকবে····এখন বোঝ!

রায়বাহাদুর চিন্তাকুল কণ্ঠে বললেন, শুধু খোঁড়া হয়ে ফিরে এলেও যে বাঁচি। কিন্তু কি যে হয়েছে আমি বুঝতেই পারছি না। যদি সাংঘাতিক কিছু একটা—

রাজলক্ষ্মী বললেন, ঘোড়া যখন শুধু ফিরে এসেছে তখন একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়।

ফকির এবং সুজিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। সুজিত ব্যাপারটা অনুমান করে নিল। মঞ্জু ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গিয়েছিল, তারপর বেকায়দায় কখন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছে— ঘোড়াটি মঞ্জুকে না নিয়ে একাই ফিরে এসেছে।

রায় বাহাদুরের কাছে এসে সুজিত বললে, এসব গবেষণা রেখে আগে মঞ্জু দেবীর খোঁজটা নেওয়া উচিত নয় কি? এখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা করে কোন লাভ আছে?

রায়বাহাদুর বললেন, ঠিক। আমিও তাই বলছি—

—কোন্ দিকে তিনি বেড়াতে যান আপনার জানা আছে ত?

—তা আছে?

—তা হ'লে আর দেরী করবেন না। আপনার গাড়ীটা বার করুন। সোফার গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে এলো। সুজিত আর বাক্যব্যয় না করে রায়বাহাদুরকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়ি চললো মঞ্জুর সন্ধানে।

নানা জায়গায় খুঁজেও মঞ্জুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষ পর্য্যন্ত গাড়ি সহরের বাইরে এসে পড়লো। এদিকটা ফাঁকা, কোথাও বা মাঠ কোথাও বা জঙ্গল। সুজিত গাড়ি থামিয়ে রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করলে, উনি এদিকটাতেও প্রায়ই বেড়াতে আসেন বলছিলেন না?

রায়বাহাদুর বললেন, তাইতো আসে। হঠাৎ এমন কাণ্ড হবে কে জানতো। দেখতে পাবো বলে যে আর ভরসা হচ্ছে না ডাক্তার রায়।

সুজিত বললে, মিছে ভাববেন না, তাঁকে সুস্থ অবস্থাতেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

সুজিতের কথায় রায়বাহাদুর উচ্ছসিত হয়ে উঠলেন ; হঠাৎ তার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, না পেলে জীবনে যে আমার আর কিছু থাকবে না ডাক্তার। পাঁচ বছর বয়স থেকে মা-মরা মেয়েকে একাধারে বাপ-মা হয়ে মানুষ করেছি। আমার যা কিছু কাজ-কারবার শুধু ওরই জন্যে। শেষকালে কি···

—কেন আপনি উতলা হচ্ছেন, এমন কি হয়েছে যার জন্যে···

সুজিতকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রায়বাহাদুর বললেন, আমি যে অনেক আশা করেছিলাম ডাক্তার রায়। আমার বয়েস হয়েছে, ক্ষমতায় আর কুলোয় না। ভেবেছিলাম আপনার হাতে মঞ্জুর সঙ্গে আমার সব কিছুর ভার তুলে দিয়ে আমি একটু বিশ্রাম করতে যাব এবার। আমার সব আশা এমনি করে বৃথা হয়ে যাবে।

সুজিত মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। যাক, এদিকটা তা হ'লে ঠিক আছে। কিন্তু এখন আনন্দ প্রকাশ করবার সময় নয়, আরও কিছু কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া দরকার। সুজিত বললে, এসব কথা শুনে সুখী হলাম, কিন্তু এখন এসব উচ্ছাস শুনতে গেলে মঞ্জু দেবীকে খোঁজার দেরী হয়ে যাবে। আপনি গাড়িতে বসুন। আমি নেমে একটু খুঁজে দেখি।

তাই হোলো। মোটর থেকে নেমে সুজিত প্রথমে মাঠটা ঘুরে দেখলো। তারপর এগিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

মঞ্জু এই জঙ্গলের মধ্যেই ছিল। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে চোট লেগেছিল পায়ে, হাঁটবার চেষ্টা করে বেশী দূর যেতে পারে নি ; একটা ঝোপের আড়ালে বসে বিশ্রাম করছিল।

সুজিত খানিক পরে সেই ঝোপটার কাছে এসে পড়লো। মঞ্জু

তাকে লক্ষ্য করে ভেতর দিকে সরে গেল। সুজিত তাকে এই অবস্থায় দেখে এটা তার ইচ্ছা নয়

সুজিতের সন্ধানী দৃষ্টি কিন্তু ভুল করলো না। মঞ্জুকে আবিষ্কার করে সে মনে মনে হাসলো, কিন্তু মুখের ভাবটা আগের মতই চিন্তাকুল করে রাখলে, যেন মঞ্জুকে দেখতেই পায় নি। এর পর কি করা কর্ত্তব্য সেটাও সে মনে মনে ঠিক করে ফেললে।

খোঁজার ভান করতে করতে কয়েক পা এগিয়ে গেল, তারপর আবার সেই ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়াল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে চেয়ে—যেন নিজের মনেই বলতে লাগলো, না, খোঁজ পাওয়া আর গেল না। কোথায় কোন্ খানায় কিম্বা ডোবায় পড়ে আছে! আনাড়ীর আবার এসব ঘোড়ায় চড়ার সখ্ কেন!

আনাড়ী কথাটায় মঞ্জুর আপত্তি ছিল। তার মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠলো। সুজিত আড় চোখে একবার ঝোপের দিকে চেয়ে নিয়ে বললে, যাই, রায়বাহাদুরকে বলি গিয়ে যে মেয়ের আশা তাঁকে ত্যাগ করতে হোলো।

মঞ্জু আরও চটে উঠলো। কি আশ্চর্য্য লোকটা! মঞ্জুকে খুঁজে পাওয়া যাক বা না যাক, সে ঘোড়ায় চড়তে জানুক বা না জানুক, তার এত মাথা ব্যথা কেন?

মঞ্জু উত্তেজিত হয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম করতেই কাঁটা-লতায় তার জামার হাতাটা আটকে গেল, হাতেও ফুটলো কয়েকটা কাঁটা। মঞ্জু নিজের অজ্ঞাতেই শব্দ করে ফেললো: উঃ!

সুজিত যেন এই মাত্র তাকে দেখতে পেলে এমনি একটা ভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, এই যে আপনি এখানে! ঘোড়া থেকে পড়ে অক্ষত আছেন যে!

মঞ্জু জামার হাতাটা কাঁটা-লতা থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বিরক্তভাবে বললে, আপনি বোধ হয় তাতে দুঃখিত!

সুজিত বললে, পরোপকারের এত বড় একটা সুযোগ ফস্কালে দুঃখ একটু হয় বৈকি। আপনাকে আমি অন্য কোন বিষয়ে সাহায্য করতে পারি কি?

—কোন দরকার নেই। আপনি যান।

রাগ দেখাবার জন্যে মঞ্জু এমন জোরে মাথাটা নাড়লে যে কাঁটা লতায় জামাটা আরও বেশী জড়িয়ে গেল। মঞ্জু যতই হাতটা টেনে নেবার চেষ্টা করে, কাঁটাগুলো ততই যেন বেশী করে ফুটতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত সুজিতই এগিয়ে এসে কাঁটার আঘাত থেকে তাকে উদ্ধার করলে। মঞ্জু ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে এমন গম্ভীর হয়ে গেল যেন সুজিত একটা মস্ত অন্যায় করে ফেলেছে।

সুজিত বললে, আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে? বিশেষ করে, আপনার সাহায্যের জন্যেই যখন আমার এখানে আসা।

—আপনাকে আমি সাহায্যের জন্যে ডাকি নি।

মঞ্জু যেন ফেটে পড়লো। সুজিত তবু নিরস্ত হলো না; বললে, কিন্তু আমি যে না ডাকতেই এসেছি। জানেন তো কারও বিপদ দেখলে আমি চুপ করে থাকতে পারি না, ওই আমার এক বদ অভ্যাস।

—আমার কোন বিপদ হয় নি, আর হলেও আপনার সাহায্য নিতে আমি চাই না।

—তা হলে আমি নাচার। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার কত কাজে আমি লাগতে পারতাম। হাত ভেঙ্গে থাকলে first aid, পা ভেঙ্গে থাকলে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া…

মঞ্জুর পায়ের চোট সামান্য হ'লেও তখনও একটু ব্যথা করছিল, কিন্তু তাই বলে দাঁতের ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে? কখনো না।

মঞ্জু বললে, আপনি এখান থেকে যাবেন কি না বলুন। নইলে আমি চিৎকার করবো।

সুজিত বললে, সেটা শুধু অনর্থক পরিশ্রম করা হবে। এই

তেপান্তরে সে মধুর স্বর কে শুনবে বলুন! তার চেয়ে আমিই চলে যাচ্ছি। আপনি বরং বিশ্রাম করে কিঞ্চিৎ শক্তি সংগ্রহ করুন। এখান থেকে সহর পর্য্যন্ত হেঁটে যাওয়া তো কম কথা নয়।

সুজিত কয়েক পা এগিয়ে গেল। এখান থেকে হেঁটে বাড়ি যাবার কল্পনায় মঞ্জুর মুখ শুকিয়ে উঠেছিল। সে ডাকলে: শুনুন।

—হ্যাঁ, বলুন।—ফিরে এসে সুজিত জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কি তা হ'লে মতলব বদলালেন?

মঞ্জু সত্যিই সুজিতের সাহায্য চাইতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুজিতের 'মতলব' কথাটায় সে আবার চটে উঠলো। বললে, না, আপনি বাবাকে গাড়ি নিয়ে আসতে বলবেন।

সুজিত অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে সবিনয়ে প্রশ্ন করলে, মাফ করবেন, কিন্তু···সেটা কি উচিত হবে?

—তার মানে? মঞ্জু বাঁকা চোখে তার দিকে চাইলো।

সুজিত বললে, মানে অতি পরিষ্কার। আপনার বাবাকে গিয়ে খবর দেওয়াও এক রকম সাহায্য তো? আমার সাহায্য নিতে আপনি যখন একেবারেই নারাজ, তখন জুলুম জবরদস্তি করে সাহায্য করাটা কি অন্যায় হবে না?

—বেশ, আপনি যেতে পারেন।

—হ্যাঁ যাচ্ছি। আমি মনে করবো, আপনার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। মঞ্জু উত্তর না দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলো।

সুজিত নীল আকাশের দিকে দার্শনিকোচিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে বললো, ভুলে যাবার চেষ্টা করবো যে আপনি তেপান্তরের মাঝে একা অসহায় ভাবে পড়ে আছেন। লোক নেই, জন নেই, তেষ্টা পেলে এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত পাবার উপায় নেই।

মঞ্জু তেমনি ভাবে চেয়ে রইলো, সুজিত বললে, আচ্ছা চলি, রায়বাহাদুর গাড়িতে বসে এতক্ষণ কি ভাবছেন কে জানে।

মঞ্জু প্রায় লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা গাড়িতে এসেছেন?

—এসেছেন বইকি।

—আর আপনি আমায় কিছু বলেন নি?

—বলার কোন দরকার হয় নি? তিনি আমাকেই আপনার খোঁজে পাঠিয়েছেন। আমি যখন বলতে গেলে আপনাকে খুঁজেই পেলাম না, তখন সে কথা তুলে আর লাভ কি। আচ্ছা নমস্কার। আশা করি আপনি এটুকু রাস্তা নিরাপদে যেতে পারবেন। এমন বেশী নয়, বড় জোর ঘণ্টা চারেক সময় লাগবে।

সুজিত মঞ্জুর দিকে চেয়ে এবার সত্যি সত্যিই হাঁটতে সুরু করলো।

মঞ্জু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, লোকটা সত্যিই যদি বাবার কাছে কোন কথা না বলে, বাবা যদি হতাশ হয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে যান···তা হলে? দুপুর রোদে এতটা পথ হেঁটে যাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, বিশেষতঃ পায়ের ব্যথাটা এখনও···

মঞ্জুও চলতে সুরু করলো।

সুজিত পিছু ফিরে একবার মঞ্জুকে দেখে নিয়ে মনে মনে হাসলো। তার ষ্ট্র্যাটেজি এবারও নির্ভুল!···

সুজিত এবার একটু ধীরে হাঁটতে লাগলো। খানিক পরে মঞ্জু তার কাছাকাছি এসে পড়তে সুজিত গম্ভীর মুখে বললে, আপনি আসছেন, আমি এতে অত্যন্ত সুখী হ'লাম। কিন্তু দেখবেন, শেষে যেন সাহায্য করবার অপবাদ দেবেন না।

মঞ্জু জবাব না দিয়ে হাঁটতে লাগলো। মনে মনে বললে, Incorrigible। সুজিতের পিছনে পিছনে মঞ্জু জঙ্গল আর মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছতেই রায়বাহাদুর গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন, এই যে মা মঞ্জু। আমি এতক্ষণ ভেবে সারা হচ্ছিলাম। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ডাক্তার রায়।

সুজিত বললে, উহুঁ, আমাকে ধন্যবাদ দেবেন না রায়বাহাদুর। মঞ্জু দেবী তা হ'লে হয়ত আবার মাঠে কিম্বা জঙ্গলে ফিরে যেতে পারেন।

রায়বাহাদুর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে একবার মেয়ের দিকে, আর একবার সুজিতের দিকে চাইলেন, তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, আজ আপনি না থাকলে—

রায়বাহাদুরের কথা শেষ হবার আগেই মঞ্জু বিরক্তি সহকারে বলে উঠলো, বাবা তুমি এখন যাবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কইবে? আমি আর দেরী করতে পারছি না—

উত্তেজিত মঞ্জু গাড়িতে উঠলো এবং অন্যমনস্ক ভাবে ড্রাইভারের পাশের আসনটিতে বসে পড়লো। সুজিত হাসি চেপে গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলো এবং ড্রাইভারের সীটে বসলো। সুজিত গাড়ি চালাবে মঞ্জু এটা কল্পনা করে নি, তাকে ড্রাইভারের আসনে দেখেই সে নেমে যাবার চেষ্টা করলো; কিন্তু সুজিত তাকে নামবার অবকাশ না দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে। রায়বাহাদুর আগেই পিছনের সীটে গিয়ে বসেছিলেন।

ডাক্তার রায় গোবিন্দর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বহু কষ্টে রায়বাহাদুরের বাড়ী খুঁজে বার করলেন। বাইরে ফকিরচাঁদ চাকর-বাকরদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। ডাক্তার রায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এইটে তো রায়বাহাদুর অধরনাথের বাড়ী।

চাকরদের একজন বললে, হ্যাঁ।

ডাক্তার রায় বললেন, তাঁকে একটু খবর দিতে পার? বলবে, ডাক্তার রায় এসেছেন। ফকিরের মুখ শুকিয়ে গেল। চাকররাও কম অবাক হয় নি। তাদের একজন বললে, আজ্ঞে···তিনি তো ডাক্তার রায়ের সঙ্গেই বেরিয়ে গেলেন।

এবার আশ্চর্য হ'বার পালা ডাক্তার রায়ের। তিনি গোবিন্দর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, সে কি!

গোবিন্দ ডাক্তার রায়কে দেখিয়ে বললে, ইনিই তো ডাক্তার রায়।

ফকিরের বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, সে একটু এগিয়ে এসে বললে, কি বললেন? আপনিই ডাক্তার রায়, মানে দাঁতের ডাক্তার?

ডাক্তার রায় বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি কাল আসতে পারি নি—বড় একটা বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম—

ফকিরের মাথার মধ্যে যেন কয়েকটা বড় লাট্টু ঘুরছিল বোঁ বোঁ করে। সে একটা ঢোক গিলে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, ভীষণ বিভ্রাট।

তারপর অন্যমনস্কতার ভাণ করে সেখান থেকে সরে গেল।

ডাক্তার রায় চাকরদের বললেন, আমি রায়বাহাদুরের জন্যে একটু অপেক্ষা করতে পারি?

চাকররা তাঁকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে ড্রয়িং রুমে বসালে।

খানিক পরেই গাড়ি সমেত সুজিত, রায়বাহাদুর আর মঞ্জু ফিরে এলো। মঞ্জুকে পেয়ে সবাই খুশী হয়ে উঠলো। মঞ্জু ভিতরে চলে গেল।

রায়বাহাদুর ড্রয়িং রুমের দিকে যেতে যেতে বললেন, ডাক্তার রায় আমি আজকের এই ব্যাপারে ভাগ্যের নির্দ্দেশ দেখতে পাচ্ছি।

ফকির বারান্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ইসারা করে সুজিতকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে ব্যাপার ঘোরাল হয়ে উঠেছে, সে যেন ভেতরে না ঢোকে···

সুজিতের মন তখন জয়ের নেশায় ভরপুর। সে রায়বাহাদুরকে হাত করে ফেলেছে, আর ভাবনা কি। সুজিত ফকিরকে দেখেও দেখলো না, রায়বাহাদুরের সঙ্গে ড্রয়িং রুমের দিকে যেতে যেতে বললে, আমিও পাচ্ছি। কিন্তু তার মানেটা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

রায়বাহাদুর বললেন, না, আর আপত্তি করবেন না ডাক্তার রায়। মঞ্জুকে খুঁজে বার করবার ভার আজ যেমন করে নিয়েছেন, তেমনি করে তার সব ভার এবার আপনি নিন। ফকির তখনও ইসারায় আসন্ন বিপদের গুরুত্বটা সুজিতকে বোঝাবার চেষ্টা

করছিল, কিন্তু সুজিতের সেদিকে আর চোখ পড়লো না। রায়বাহাদুরের কথার জবাবে সে হাসতে হাসতে বললে, দেখুন···আপনি এখনও—বলতে গেলে আমার কোন পরিচয়ই পান নি।

—যা পেয়েছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রায়বাহাদুরের সরল বিশ্বাস সুজিতের মনে কাঁটার মত বিঁধছিল, সে ঠিক করলে, আসল ব্যাপারটা তাঁকে জানাবে। এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে সে বললে, না, রায়বাহাদুর, আপনাকে এবার আমি গোটাকতক সত্যি কথা বলতে চাই। গোড়া থেকে আপনারা আমার সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা করে বসে আছেন, সেটা আমি এবার ভেঙ্গে দিতে চাই।

রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে বললেন, আপনার সম্বন্ধে ধারণা আর ভাঙ্গবার নয়। আর কিছু না হোক, আমি মানুষ চিনি।

সুজিত আরও লজ্জিত, আরও অসহায় বোধ করতে লাগলো। কী আশ্চর্য্য! একটা অন্যায় হয়ে গেছে বলে, সত্যি কথা বলবার চেষ্টা করলেও কেউ সে কথা শুনতে চাইবে না।

ড্রয়িং রুমে ঢুকতে ঢুকতে সুজিত শেষবার চেষ্টা করলো : তবু আজ সব কথা আপনাকে শুনতে হবে।

রায়বাহাদুর বললেন, বেশ তো, শুনবোখন তার জন্যে তাড়াতাড়ি কিসের!

ডাক্তার রায় এবং গোবিন্দ এই ঘরেই ছিল। রায়বাহাদুর ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার রায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনিই কি রায়বাহাদুর অধরনাথ চাটুয্যে?

রায়বাহাদুর : আজ্ঞে হ্যাঁ····কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

ডাক্তার রায় বললেন, না, আপনার সঙ্গে আমার আগে দেখা হয়নি। আর হবে কি করে বলুন! যা বিভ্রাটে পড়ে গেলাম রংপুর ষ্টেশনে নেমেই—কি বলবো মশাই, আমায় কি না থিয়েটারে ধরে নিয়ে গিয়ে বলে গান গাও···

রায়বাহাদুর কিছুই বুঝতে পারছিলেন না, আশ্চর্য্য হয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন···

ফকির ওদের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে ক্রমাগত ইসারা করে যাচ্ছিল—এবার সুজিতের চোখ পড়লো সেই দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা সে অনুমান করে নিতে চেষ্টা করলো।

ডাক্তার বলছিলেন: শুধু তাই নয় মশাই—সং সাজিয়ে শেষে ষ্টেজের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলে—এই জিজ্ঞাসা করুন গোবিন্দকে।

গোবিন্দ সায় দিতে দেরী করলো না: আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দিলে। পেলেটা কিন্তু খাশা ছিল।

ডাক্তার রায় ধমকে উঠলেন: তুমি চুপ করো গোবিন্দ। খাশা প্লে ছিল! খাশা ছিল তো আমার কি! আমি কি থিয়েটারের এ্যাক্টর!

গোবিন্দ বললে, আজ্ঞে না। তা কেন···

রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুজিতের দিকে চাইলেন। সুজিত ইসারা করে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে লোকটির বোধ হয় মাথার ঠিক নেই।

রায়বাহাদুর বললেন, আপনি তা হ'লে কি?

ডাক্তার রায় বললেন, আমি······

সুজিত দেখলো, বোমা ফাটবার আর দেরী নেই। লোকটি নিশ্চয়ই ডাক্তার রায়, তিনি আসল পরিচয়টা দিয়ে ফেললেই তার সমস্ত রঙীন কল্পনা এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হবে। কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য সে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করলে, আপনি কি তা হ'লে সত্যি অভিনয় করলেন?

—অভিনয় করবো আমি? বলেন কি? আমি কি রংপুরে অভিনয় করতে এসেছি? কোথায় বলে······

কোথায় কি বলে তা শোনবার ধৈর্য্য, প্রয়োজন বা সাহস সুজিতের ছিল না, সে বললে, ঠিক বলেছেন। কোথায় বলে রংপুর—একি অভিনয় করবার জায়গা! হ্যাঁ হোতো কলকাতা কি দিল্লী······

ডাক্তার রায় বিব্রত হয়ে পড়ছিলেন, বললেন, না, না, আমি তা বলছি না, আমি বলছি যে···

সুজিত বললে, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আর একটি কথাও আপনার উচ্চারণ করবার দরকার নেই। আপনার মনের অবস্থা আমরা ভাল করে বুঝতে পারছি। বলেন কি মশাই, একটি নিরীহ নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধ লোককে ধরে ষ্টেজে নামিয়ে দেওয়া—এ কি মগের মুল্লুক! এখানে কি আইন নেই?

রায়বাহাদুর সুজিতকে বললেন, দেখুন ডাক্তার রায়, আমরা এখনও এর পরিচয়টা ঠিক···

ডাক্তার রায় লজ্জিতভাবে বললেন, ওঃ! আমার পরিচয়টাই বুঝি দিতে ভুলে গেছি! আমি—

সুজিত বাধা দিয়ে বললে, উহুঁহুঁ, পরিচয় কি দেবেন আবার! পরিচয় তো আপনার মুখে লেখা রয়েছে! মুখ দেখে পরিচয় বুঝতে পারছেন না রায়বাহাদুর?

—মুখ দেখে সকলের পরিচয় বোঝা যায় না।

কথাটা বললে মঞ্জু, বিনোদের সঙ্গে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে।

সুজিতের চোখের সামনে সব ঝাপসা ঠেকতে লাগলো।

মঞ্জু শ্লেষ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, দেখুন না বিনোদবাবু, আপনার বন্ধু ডাক্তার রায়কে মুখ দেখেই চিনতে পারছেন তো?

বিনোদ যেন আকাশ থেকে পড়লো।

—ডাক্তার রায়! কে বললে ইনি ডাক্তার রায়!

মঞ্জু তেমনি বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বললে, কে আর বলবে! উনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন! কারও জন্যে অপেক্ষা করেন নি।

বিনোদ একবার ভাল করে সুজিতের দিকে চাইলো। এই লোকটাই তাকে ধাপ্পা দিয়ে সেদিন তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় করে দিয়েছিল, তার জন্যে তাকে কম নাকাল হতে হয় নি। বিনোদ ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে উঠলো, এই যে দেখছি উনি কেমন ডাক্তার রায়। এখুনি পুলিশে খবর দিন। একে জেলে না পাঠিয়ে ছাড়ছি না।

রায়বাহাদুরের মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। সুজিতকে তিনি সত্যি ভালবেসেছিলেন। বিনোদের ধমকানি তাঁর ভাল লাগলো না; তিনি বলে উঠলেন: আঃ বিনোদ! তোমার মাথা খারাপ! কাকে যা'তা বলছো জানো?

বিনোদ বললে, জানি বৈকি। একটা জোচ্চোর, একটা ধাপ্পাবাজ, একটা···রাগে বিনোদ আর কথা খুঁজে পেল না, বাটার-ফ্লাই গোঁফটা শুধু ঠোঁটের ওপর নাচতে লাগলো···

বিনোদের কথার ভাবটা সুজিতই পূরণ করলে: হ্যাঁ, বলুন বলুন—একটা জালিয়াৎ—

বিনোদ বললে, হ্যাঁ, একটা জালিয়াৎকে···

বলেই তার খেয়াল হলো যে এ কথাটা সুজিতই জুগিয়ে দিয়েছে। সে আরও ক্ষেপে উঠলো, সুজিতের মুখের দিকে জ্বলন্ত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বললে, আপনি···আপনি এখনও নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

মঞ্জু বললে, ওইটেই যে ওঁর বিশেষত্ব।

রায়বাহাদুর আর সহ্য করতে পারছিলেন না, তিনি মঞ্জুর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন: তোরা সবাই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি! কি হচ্ছে কি! ব্যাপারটা কি তাই আগে জানতে চাই—

বিনোদ বললে, আশ্চর্য্য! এখনও জানেন নি! বুঝতে পারেন নি কি আপনাকে কি রকমভাবে জঘন্য প্রতারণা করা হয়েছে। ডাক্তার রায় ভেবে যাকে আপনি সসম্মানে বাড়ীতে জায়গা দিয়েছেন সে জাল।

রায়বাহাদুর বিশ্বাস করলেন না, বললেন জাল! কখনও না। হতে পারে না। বিনোদ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—আমার মাথা খারাপ হয়েছে? বিনোদ গর্জ্জে উঠলো: জানেন আমি ছেলেবেলা থেকে ডাক্তার রায়কে চিনি—

রায়বাহাদুর দমলেন না, বললেন, তা হলে ছেলেবেলা থেকে তোমার মাথা খারাপ! আমার বাড়ীতে, আমার অতিথিকে অপমান করবার কোন অধিকার তোমার নেই।

বিনোদ রাগ করে বললে, বেশ, আমি চাই না কোন কথা বলতে।

মঞ্জু বললে, তোমার মাননীয় অতিথির পরিচয় তা হ'লে তুমি নিতে চাও না বাবা?

রায়বাহাদুর বললেন, আঃ মা, তুই আবার এসবের ভেতর কেন? ওর কি আর পরিচয় নেব বল্‌তো? উনি যদি ডাক্তার রায় না হবেন তা হ'লে কে ডাক্তার রায়?

ডাক্তার রায় এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে এই নাটকীয় কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করছিলেন, এইবার এগিয়ে এসে বললেন, আজ্ঞে, আমি……

রায়বাহাদুর বিরক্ত হয়েই ছিলেন, আরও বিরক্তভাবে বললেন, হ্যাঁ বলুন কি বলবেন। আপনি জানেন কে ডাক্তার রায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সেই কথাই তো বলছি। আমি—

—রবু আমি! আমি কিসের? কে ডাক্তার রায় তাই বলুন।

—আজ্ঞে ডাক্তার রায় হলাম আমি অর্থাৎ আমিই ডাক্তার রায়। কিম্বা বলতে পারি, আমিও যে ডাক্তার রায়ও সে, অথবা—

—থামুন, থামুন। আমায় বুঝতে দিন। আপনি বলছেন, আপনিই আমেরিকা ফেরৎ দাঁতের ডাক্তার—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস তাই—

বিনোদ এর আগে ডাক্তার রায়কে দেখবার ফুরসৎ পায় নি, ডাক্তার রায় কথা বলতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। এইবার ডাক্তার রায়কে জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠলো, এইত—এইত ডাক্তার রায়।

বিনোদ এবার গর্ব্বিত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো রায়বাহাদুরের দিকে। রায়বাহাদুরের মাথার ভেতর ভূমিকম্প সুরু হয়েছিল, পায়ের তলায় মার্ব্বেলের মেঝে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল যেন; তিনি একান্ত অসহায় ভাবে সুজিতের দিকে চেয়ে বললে, তা হ'লে, তা হ'লে…

সুজিত বললে, বুঝেছি। সমস্যাটা এবার আমাকেই সরল করে দিতে হবে। দেখুন, আমি দাঁতের ডাক্তার নই, হাত পা মুখ··· কোন কিছুর ডাক্তার নই। আমি নিতান্ত নগণ্য সাধারণ একজন সুজিত চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা বেকার-সঙ্ঘের ভ্রাম্যমান অবৈতনিক সেক্রেটারী।

বিনোদ বললে, জুয়োচোর-সঙ্ঘের সেক্রেটারী। আপনি যদি ডাক্তার রায়ই না হন তা হ'লে কি জন্যে ওই নামে এ বাড়ীতে এসে উঠেছেন? কি জন্যে এতদিন ধরে এঁদের ঠকিয়েছেন? আপনার মতলব কি?

—মতলব ওঁর অত্যন্ত গভীর। মঞ্জু বিদ্রূপের আর একটা বাণ ছুঁড়লো।

বিনোদ বললে সুজিতকে, জানেন এর জন্যে আপনাকে জেলে যেতে হবে?

সুজিতের অবস্থা দেখে ডাক্তার রায় নিজেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছিলেন; বললেন, আঃ বিনোদ, উনি কি বলতে চান আগে ওঁকে বলতে দাও না।

সুজিত তাঁর দিকে চেয়ে বললে, ধন্যবাদ ডাক্তার রায়, আপনার নামটা বাধ্য হয়ে কদিন ব্যবহার করেছি বলে আপনার কাছে মার্জ্জনা চাইছি। কিন্তু সত্যি জানবেন অপরাধটা স্বেচ্ছাকৃত নয়। রংপুরে এসে পৌঁছান মাত্র এমন ঘটা করে ওই নামটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় যে আমি কিছু বলবার ফুরসতই পায় নি।

বিনোদের রাগ তখনও পড়েনি, সে বললে, ফুরসত কি এতদিনেও আপনার মেলেনি? আপনি কি বুঝতে পারেন নি যে নাম ভাঁড়িয়ে এভাবে এঁদের বাড়ীতে থাকা জুয়োচুরি?

—বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি। সুজিত ম্লান একটু হেসে আবার বলতে লাগলো, তবু কেন জেনেশুনেও সত্য কথা বলতে পারিনি বা চলে যাইনি জানেন!

কথাটা বলে সুজিত মঞ্জুর দিকে চাইলো, যেন যে কৈফিয়ত সে

দিতে চলেছে সেটা শুধু মঞ্জুর জন্যেই। মঞ্জু আশ্চর্য্য হয়ে মুহূর্ত্তের জন্যে তার মুখের দিকে চাইলো, পরমুহূর্ত্তেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চাইবার চেষ্টা করলো। ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যেত ঃ কঠিন বরফের গায়ে আগুণের আঁচ লেগেছে—

সুজিত বললে, আমাদের মত হতভাগ্যদের পক্ষে মিথ্যা জেনেও এমন স্বপ্ন ভেঙ্গে ছেড়ে যাওয়া কঠিন বলে। দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র আর ভাগ্য মিলে আমাদের মত হাজার হাজার বেকার ছেলের সঙ্গে যে জুয়াচুরিটা করেছে তার কোন খোঁজ রাখেন? আমরা শিক্ষা পেয়েছি, সে শিক্ষার ভিতর দিয়ে বড় বড় আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের ভেতর জাগিয়ে, বড় বড় কীর্ত্তির স্বপ্ন আমাদের দেখিয়ে, শেষকালে নিষ্ঠুর ভাবে আমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের হাত পা বাঁধা, কোন দিকে কোন ভরসা আমাদের নেই। নিজেদের কোন যোগ্যতা আছে কি না সেটুকু যাচাই করবার সুযোগও আমরা পাব না। সব দিকের দরজা আমাদের কাছে বন্ধ, মাথা খুঁড়লেও সে দরজা খোলা যায় না···

সুজিত একবার ভাল করে চেয়ে দেখলো সবার মুখের দিকে, তারপর ধরা গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে সুরু করলো ঃ

চারিদিকে এই নিষ্ফলতা—তার মাঝখানে দৈব বোধ হয় পরিহাস করে কদিনের জন্যে এই সৌভাগ্যের মরীচিকা আমাদের দেখিয়েছিল। তার প্রলোভন জয় করতে আমি পারিনি স্বীকার করছি, তার জন্যে যা শাস্তি দিতে হয় দিন, আমি প্রস্তুত আছি।

সুজিতের কথা শেষ হবার পর সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কেবল দেখা গেল মঞ্জু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

সুজিত তার কাছে গিয়ে বললে, আপনার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়াটা বিশেষ ভাবে দরকার মঞ্জুদেবী—হয়তো আমি আপনার উপযুক্ত সম্মান সব সময় দিতে পারিনি।

মঞ্জু ফিরে চাইলো না সুজিতের দিকে···সে প্রায় ছুটতে ছুটতে

বেরিয়ে গেল। সুজিত মিনিটখানেক সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর ফিরে এলো আর সকলের কাছে। তারপর রায়-বাহাদুরকে লক্ষ্য করে বললেঃ ইচ্ছে করলে আপনি আমায় জেলে দিতে পারেন রায়বাহাদুর, তবে আমার সঙ্গীটি নির্দ্দোষ। শুধু আমার জেদেই তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে থাকতে হয়েছে। ওকে আমার অপরাধের সঙ্গে জড়াবেন না, এই আমার অনুরোধ। ফকির এগিয়ে এসে বললে, হুঁঃ! তুমি একাই জেলে যাবে ভাবছো বুঝি! উহুঁ, সে হবে না। আমি তোমার সঙ্গ ছাড়লে তো!…নিন্, যা করতে হয় চটপট করে ফেলুন রায়বাহাদুর।

রায়বাহাদুর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, আপনারা অত্যন্ত ভুল করছেন, জেলে দেবার কথা কি আমি বলেছি?

সুজিত বললে, না বলে থাকলে সেজন্য আমরা অবশ্য আপনাকে পেড়াপীড়ি করবো না। এখন আপনার অনুমতি পেলে আমরা আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে বিদায় হতে পারি। রায়বাহাদুর কি বলবেন ঠিক করতে পারছিলেন না, বললেন, আপনি চলে যাচ্ছেন… এতে অবশ্য আমার কিছু বলবার নেই…

—বলতে আপনি অনেক কিছুই পারেন। শুধু বলা কেন, জেলে না দিয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করলেও আমরা বিস্মিত বা দুঃখিত হব না।

—না, না, সে কি কথা! আমি বলছিলাম কি—সেই যখন যাবেনই, এ বেলাটা এখানে থেকে গেলে হ'ত না?

বিনোদের আর সহ্য হল না, সে ব্যঙ্গকণ্ঠে বলে উঠলোঃ এ যে জামাই বিদায় করছেন বলে মনে হচ্ছে রায়বাহাদুর! এ রকম জালিয়াতকে জেলে না দেওয়া কত বড় অন্যায় তা ভেবে দেখেছেন?

ডাক্তার রায় বিনোদের ওপর আগেই চটে ছিলেন, এ-কথার পর আর ভদ্রতা বজায় রাখতে পারলেন না, ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, তুমি বড় বেয়াদপ বিনোদ। না বুঝে শুনে বড় বাজে বক—

সুজিত এবার সত্যিই লজ্জিত বোধ করলো, ডাক্তারের কাছে

এসে বললে, আপনার মত লোকের নাম জাল করাও সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছে!

রায়বাহাদুরের দিকে চেয়ে সুজিত বললে, আপনাকে আর একবার—শেষবার ধন্যবাদ জানিয়ে যাই রায়বাহাদুর। লজ্জা-বোধ করবার ক্ষমতা ভেবেছিলাম অসাড় হয়েই গেছে, কিন্তু আপনার কাছে আজ সত্যিকার লজ্জা পেয়ে গেলাম। যাও ফকিরচাঁদ, আমাদের জিনিষগুলো নামিয়ে নিয়ে এসো।

ফকির নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল।

সুজিত ফকিরকে নিয়ে চলে গেছে প্রায় মিনিট পনের আগে। ওদের যাবার সময় মঞ্জু দেখা করাটাও দরকার মনে করেনি। উপরে উঠে এসে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেছে, এখনও সেইখানেই—জানালার ধারে চুপ করে বসে আছে।

রমা হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে বললে, ছি, ছি, কি ঘেন্নার কথা! সব শুনেছিস তো মঞ্জু?

মঞ্জুর তরফ থেকে কোন জবাব পাওয়া গেল না।

রমা ওর কাছে এসে বললে, একেবারে পাকা জুয়োচোর! আমাদের সকলের চোখে এমন করে ধুলো দিয়ে গেল।

মঞ্জু এবার মুখটা ফিরিয়ে রমার দিকে চাইলো বটে, কিন্তু কিছু বলার দরকার মনে করলে না। রমা বলতে লাগলো, মামা-বাবুরই অন্যায়। না জেনে শুনে যাকে তাকে একেবারে জামাই আদরে বাড়ীতে এনে তুললেন! এটা কি তাঁর উচিত হয়েছে? এমন জানলে আমরা তার সামনে বেরতাম না কথা কইতাম!

—তা কইতে না বটে! মঞ্জু এতক্ষণে কথা বলল: বিলেত ফেরৎ নয়, ডাক্তার নয়, সামান্য একটা নিষ্কর্ম্মা বেকার···এর সঙ্গে আবার কিসের মেলামেশা!

মঞ্জুর কথার উহ্য খোঁচাটা রমার মগজ পর্য্যন্ত পৌঁছল না, সে

উৎসাহিত হয়ে বললে, নিশ্চয়ই। আমার এখন যা রাগ হচ্ছে! মামাবাবু কি বলে ওকে অমনি ছেড়ে দিলেন তা জানি না। এমন জোচ্চোরকে পুলিসে দেওয়া উচিত ছিল।

মঞ্জু আর একবার রমার মুখের দিকে চাইলো ভাল করে, তারপর হাসতে হাসতে বললে, তোমার রাগটাই বেশী মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে তুমিই যেন সব চেয়ে বেশী ঠকেছ?

রমা এবারও খোঁচাটা ধরতে পারলে না, বললে, মাথামুণ্ডু নেই কি যে কথা বলো। আমি একা ঠকব কেন। সবাই তো ঠকেছে। ওযে ডাক্তার রায় নয়, একটা জোচ্চোর তা কি কেউ বুঝতে পেরেছিল?

মঞ্জুর মুখে আরও একটা শক্ত কথা এসে পড়েছিল, কিন্তু তার আগেই পিসিমা অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী দেবীর কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বারান্দা এবং আশপাশ চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো: ফেলেদে, দূর করে ফেলেদে সুটকেশ! ও আবার ফেরৎ দিতে যেতে হবে।

রাজলক্ষ্মী হাঁফাতে হাঁফাতে মঞ্জুর ঘরে ঢুকলেন। পিছনে সুটকেশ হাতে একজন চাকর।

—কি হয়েছে মা? এত চেঁচাচ্ছ কেন; রমা জিজ্ঞাসা করলে।

—চেঁচাব না? রাজলক্ষ্মী বর্ত্তুলাকার শরীরটি উত্তেজনার আতিশয্যে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন: দাদার জন্যেই তো এই ফ্যাসাদ। যত রাজ্যের জোচ্চোর, জালিয়াৎ, বদমাইসকে উনি ঘরে এনে তুলবেন খাতির করে আর তোমায় আমায়—

—কি হ'লো কি? রমা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো—কিছু চুরি করে পালিয়েছে নাকি? আমি তো তখন থেকে বলছি পুলিশে দিতে...

জুয়োচোর জালিয়াৎ, চোর...শুনতে শুনতে মঞ্জু অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল, এবার আর চুপ করে থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে: কি হয়েছে কি পিসিমা জানতে পারি। কি চুরি গেছে?

রাজলক্ষ্মী বললেন, চুরি গেছে কি না জানি না বাপু, তবে সেই দুই জোচ্চোর তাদের ঘরে একটা সুটকেশ ফেলে গেছে। এখন এই সুটকেশ নিয়ে কি করি বল?

মঞ্জু বা রমা কিছু বলবার আগেই তিনি চাকরটাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, দাঁড়িয়ে আছিস কেন হতভাগা? ও সুটকেশ রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়গে। খাতির করে ওদের আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে নাকি? যা ফেলে দিগে যা'...

ফেলে দেওয়াটা ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে কি না বুঝতে না পেরে চাকরটা ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

মঞ্জু বললে, না দাঁড়াও, রাস্তায় ফেলতে হবে না।

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, রাস্তায় না ফেলে কি করবে কি? কোথাকার চোরাই মাল কে জানে—বাড়ীতে রেখে শেষে আর একটা ফ্যাসাদ হোক আর কি।

মঞ্জু বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো, বাড়ীতে রাখতে হবে না, ও সুটকেশ আমি ফিরিয়ে দিয়ে আসছি।

রমা আর রাজলক্ষ্মী—মা ও মেয়ে দুজনেই অবাক হয়ে মঞ্জুর মুখের দিকে চাইলো। রমা বললে, বল কি মঞ্জু! তুমি নিজে সুটকেশ ফেরৎ দিতে যাবে! সেই জোচ্চোরটার কাছে......

মঞ্জু তাচ্ছিল্য ভরা একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ওদের দুজনের দিকে, তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, হ্যাঁ......

চাকরটি সুটকেশ সমেত তাকে অনুসরণ করলো।

নিচে নেমে মঞ্জু গাড়ি বার করে সোজা ষ্টেশনের দিকে রওনা হোলো। চাকরটার কাছ থেকে সুটকেশটা নিতে ভুললো না।

মঞ্জু যখন ষ্টেশনে পৌছল তখন ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা পড়েছে। চারিদিকে লোকজনের ভিড়, ছুটোছুটি।

বুকিং অফিসের সামনে এসে মঞ্জু ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করলে, ট্রেণ কি এখুনি ছেড়ে দেবে নাকি?

—হ্যাঁ, এই তো ছেড়ে দিলে।

সুটকেশ হাতে মঞ্জু ছুটলো প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে। হুইসল পড়লো ট্রেণের। গার্ড পতাকা নাড়লে।

মঞ্জু ট্রেণের কামরাগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে ছুটছিল—ট্রেণ ধীরে

ধীরে চলতে সুরু করলো, কিন্তু ফকির বা সুজিতের কাউকে চোখে পড়লো না। ট্রেণ ক্রমশঃ প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়ে দূরে, আরও দূরে চলে গেল। মঞ্জু দাঁড়িয়ে রইলো উদাস চোখে সেই দিকে চেয়ে।

কে বলবে এ সেই মঞ্জু, যে ব্রীচেস পড়ে, ঘোড়ায় চড়ে, কথায় যার ছুরির ফলার ধার?

হঠাৎ পিছন থেকে সুজিতের গলা শোনা গেলঃ একি মিস্ চ্যাটার্জ্জী! আপনি এখানে? মঞ্জু চমকে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে দেখলো, সত্যি সুজিত আর ফকির! বিস্ময় আর আনন্দের ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে উঠতে মঞ্জু বললে,...আমি...আমি...মানে আপনি তা হ'লে যান নি?

—না এখনও যাবার সুবিধে পাই নি।

—তা হ'লে যাবেন কখন? ট্রেণ তো এই মাত্র ছেড়ে গেল।

—তা গেল বটে, কিন্তু ট্রেণ ছাড়লেই তাতে উঠে বসবো, এতটা বে-হিসেবী বাউণ্ডুলে এখনও হয়ে উঠতে পারিনি। যে ট্রেণটা ছেড়ে গেল সেটা আমাদের নয়। কলকাতায় যাবার ট্রেণ এইবার ছাড়বে।

মঞ্জু যেন একটু দমে গেল, বললে, আপনি তা হ'লে কলকাতায় যাচ্ছেন?

—একটা কোথাও যেতে তো হবে। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম মিস চ্যাটার্জ্জী যে ডুবতে হ'লে কুয়োর চেয়ে সমুদ্রে ডোবাই ভাল। বেকার যদি হ'তেই হয় তো কলকাতায় হওয়ায় একটা মহিমা আছে, কি বলুন!

মঞ্জু উত্তর দিল না, বোধ হয় একটু আনমনা হয়ে গেল। হাতের সুটকেশটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, আপনি এই সুটকেশটা ফেলে এসেছিলেন। মনে পড়ে নি বোধ হয়।

—মনে খুব পড়েছিল, কিন্তু ফিরে চাইতে যাবার সাহস ছিল না। সুজিত হাসবার চেষ্টা করলো। মঞ্জুও হেসে ফেললো।

সুজিত বললে, আপনি নিজে এটা পৌঁছে দিতে আসবেন আমি

কল্পনাও করতে পারি নি। আপনাকে কি করে যে ধন্যবাদ জানাব—

মঞ্জু এতক্ষণ সুজিতের দিকে চেয়েছিল, হঠাৎ মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

সুজিত একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোবার চেষ্টা করে বলতে লাগলো ঃ মনে হচ্ছে, এতক্ষণে আপনি আমাদের ক্ষমা করতে পেরেছেন। এখান থেকে অন্ততঃ সেই সান্ত্বনাটুকু নিয়ে যেতে পারবো।

—আপনি বোধহয় তাতেই সন্তুষ্ট? মঞ্জু হঠাৎ ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলো।

—নিশ্চয়ই! তার বেশী আর কি আশা করতে পারি বলুন!

মঞ্জুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ আশ্চর্য্য কঠিন হয়ে উঠলো, সে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি এখানে কেন এসেছিলেন বলতে পারেন?

এত কাণ্ডকারখানার পর এরকম একটা ছেলেমানুষী প্রশ্ন করবার কোন মানে হয় না কি!

সুজিত একটু ঘাবড়ে গিয়ে আবার বললে, নিয়তির টানে বলতে পারেন। তবে জ্ঞানতঃ কাজের খোঁজে……

কাজের খোঁজে! আপনি কাজ করবেন? কাজ করতে আপনি যেন সত্যিই চান? কথাগুলো বলতে বলতে মঞ্জু এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো যে সুজিতের মত ছেলেকেও আশ্চর্য্য হতে হোলো। একটু অপ্রস্তুত ভাবেই সে বললে, কাজ চাই না! কি বলছেন আপনি? তা হ'লে এতদিন কি জন্যে ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?

মঞ্জু এবারে যেন ফেটে পড়লো ঃ সেটা আপনার সখ, আপনার বিলাস। কাজের খোঁজ করা আপনার কাছে একটা ছল মাত্র। আসলে আপনি এমনি করে ভেসে বেড়াতেই ভালবাসেন। কোন বন্ধন, কোন দায়িত্ব আপনি মানতে শেখেন নি। আপনার কাছে কিছুরই দাম নেই, সবই আপনার কাছে খেলা—

বলতে বলতে মঞ্জুর গলা ভেঙ্গে এসেছিল, হঠাৎ হাতের সুটকেশটা

সশব্দে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর নামিয়ে রেখে বললে, এই নিন আপনার স্যুটকেশ, যেখানে খুসী আপনি যেতে পারেন এখন—

বিস্মিত বিহ্বল সুজিত ভাবলে, এ আবার কি! এত দিন যে মেয়ে তাকে আঘাত না করে কথা কয়নি, আজ সবাই যখন তাকে সাধারণ একটা বাউণ্ডুলে মনে করে বিদায় করে দিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে…

সুজিত বিহ্বল কণ্ঠে ডাকলে ঃ শোনো ঃ মঞ্জু—

—না। আর কিছু শুনতে চাই না। আপনার মত লোকের সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে না, এইটেই আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি।

সুজিত কোন কথা বলবার আগেই দেখা গেল মঞ্জু দ্রুত পায়ে তাদের কাছ থেকে অনেকটা দূরে চলে গেছে।

ফকির এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল, এইবার কথা বলবার অবসর পেল। বললে, আমি গোড়া থেকেই জানি মেয়েটার মাথায় ছিট আছে! কি আবল তাবল বকে গেল দেখত!

সুজিত ম্লান একটু হাসলো। কথা বলবার মতো মনের অবস্থা তখন নয়।

ফকির বললে, কি হে, কথা কইছো না যে?

সুজিত বললে, কথা তো দিনরাতই বলছি ফকির, জীবনে শুধু কথা বলতেই তো শিখেছি। আজ একটু চুপ করে থাকতে দাও।

সুজিতের মুখের দিকে চেয়ে ফকির আর কিছু বলতে পারলো না।

কলকাতা যাবার ট্রেণ ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো।

সুজিত প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে ট্রেণের দিকে পা বাড়াল, পিছনে পিছনে চললো ফকির।

দিন কয়েক পরের কথা।

কলকাতার এক অখ্যাত গলিতে কলিকাতা বেকার সঙ্ঘের অফিস। অফিস ঘরটিকে দেখে যদিও অফিস বলে মনে হওয়া শক্ত, কিন্তু ঘরটি বেশ বড়। ঘরের মেঝেয় খানকয়েক মাতুর-পাতা এবং এই মাতুর গুলিতে সভ্যদের ভিড়। একদল ক্যারম খেলায় ব্যস্ত, একদল কণ্ট্রাক্ট ব্রীজের হাঁক-ডাকে মত্ত, আর একদল পাশার ঘুটি নিয়ে উন্মত্ত। অবশ্য এইটুকু বললেই বেকার সঙ্ঘের সবটুকু পরিচয় দেওয়া হয় না। ঘরের এক প্রান্তে বড় একটা টেবল, খানকয়েক চেয়ারও আছে এবং এই চেয়ারগুলি দখল করে আপাততঃ যারা বিরাজ করছে তাদের তুজনকে আমরা চিনি। এরা সুজিত আর ফকির।

সুজিত তার সামনের ছেলেটির দিকে চেয়ে বললে, হ্যাঁ, এই আমার শেষ কথা।

ছেলেটির নাম অশোক। অশোক বললে, কিন্তু কেন বল দেখি? এতদিন ধরে বেকার সঙ্ঘে আছ, এ সঙ্ঘ এক রকম নিজের হাতেই গড়ে তুলেছ, এখন তুমি ছেড়ে যাবে কেন?

সুজিত বললে, সত্যিকার কিছু গড়তে পারি নি বলেই ছেড়ে যাব। হুজুক করা ছাড়া আর কি আমরা করেছি বলতে পার? সমাজ, রাষ্ট্র, আর ভাগ্যকে দোষ দিলে তো চলবে না। আমরা নিজেদের দোষেও বেকার। আলসেমী করে একটু আড্ডা দিতে পারলে আমরা আর কিছু চাই না।

সুজিত চেয়ার ছেড়ে উঠলো—যে দিকে তাস খেলা চলছিল এগিয়ে গেল সেই দিকে। খেলায় মত্ত চারজন হাতের তাসের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে সিগারেট কিম্বা বিঁড়ি টানচে। গা জ্বালা করতে

লাগলো যেন সুজিতের। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া গলাধঃকরণ আর ক্যালবার্টসনের আত্মশ্রাদ্ধ!

সুজিত একজনের হাতের তাসগুলো টেনে নিয়ে মেঝেয় ছড়িয়ে ফেলে দিল। সে এবং অপর তিনজন প্রায় সমস্বরে আর্ত্তনাদ করে উঠলো: আরে কর কি!

সুজিত বললে, বেকার সঙ্ঘ কি এরই জন্যে করা হয়েছিল নাকি?

ও পক্ষের জবাব পাবার আগেই সে এগিয়ে গেল পাশা খেলোয়াড়দের দিকে।

ছকটা টেনে ফেলে দিয়ে সুজিত বললে, এরই নাম বোধ হয় বেকার সমস্যার মীমাংসা কি বলো?

—খেলোয়াড়রা মর্ম্মাহত হয়ে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ নিকটতম আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ পেলেও তারা বোধ এতটা ব্যথা পেত না।

সুজিত বললে, দল বেঁধে আড্ডা দেওয়াকে গালভরা একটা নাম দিলেই সেটা বড় জিনিষ হয়ে ওঠে না। তার জন্যে ত্যাগ দরকার, সাধনা দরকার।—না ভাই, আমায় তোমরা মাপ করো। এ তামাসা অনেকদিন হয়েছে, আর নয়।

বেকার সঙ্ঘ গড়ে তোলার মূলে সুজিতের প্রচেষ্টাই ছিল সব চেয়ে বেশী, সবাই তাকে ভাল বাসতো যেমন, শ্রদ্ধা-ভয়ও করতো ঠিক তেমনি। তার মুখের ওপর কথা বলার ক্ষমতা অনেকেরই ছিল না।

অশোক শুধু বললে, এখন যাচ্ছ যাও, কাল সকালেই আবার ধরে নিয়ে আসবো।

সুজিত বললে, না ভাই, তা পারবে না, কারণ, এখন থেকে আমার নিজের ঠিকানা আমি নিজেই জানি না।

ফকির এগিয়ে এসে বললে, চলো তা হলে। একসূত্রে বাঁধিয়াছি দুইটি জীবন।

সুজিত বললে, না ফকিরচাঁদ, এবার আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে

তোমাকেও আর জড়াতে চাই না। এবার আমায় একাই যেতে হবে। গুড বাই টু ইউ অল্।

সুজিত চলে গেল। ফকির ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

অশোক জিজ্ঞাসা করলে, কি হে সুজিতের হঠাৎ বৈরাগ্য উদয় হোলো যে?

টেবলে বসে ছেলেদের একজন একতাড়া চিঠি নিয়ে বাছছিল, ফকির কিছু বলবার আগেই সে বললে, কিছু না ভাই কিছু না, বক্তৃতার একটা প্যাঁচ মেরে গেল।

ক্যালবার্টসন পন্থীরা আবার তাস নিয়ে বসলো। ছড়ানো তাসগুলো কুড়োতে কুড়োতে তাদের একজন বললে, ধ্যেৎ আমাদের নির্ঘাৎ রাবারটা মাটি হয়ে গেল।

পাশার দলও ছক সাজাতে লাগলো। তাদের একজন বললে, আরে দুর, আমার তিনটে ঘুঁটি পেকে এসেছিল।

যে ছেলেটি চিঠি বাছাই করছিল সে হঠাৎ মুখ তুলে বললে, ওকে ডাক ভাই—সুজিতকে, শিগগির—ওর একটা চিঠি আছে।

ফকির তাড়াতাড়ি টেবলের কাছে এগিয়ে এলো।

অশোক বললে, তাকে এখন পাবে কোথায়! ঠিকানাও তো বলে গেল না যে পৌঁছে দেওয়া যাবে।

চিঠি বাছাইয়ে নিযুক্ত ছেলেটি হাতে একখানা খাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, চিঠিটার একটু বিশেষত্ব আছে মনে হচ্ছে। খামটার চেহারা দস্তুরমত বনেদী,—

ছাপ দেখছি রংপুরের—

—রংপুরের! দেখি—

ফকির হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে নিল।

অশোক বললে, রেখে দাও তোমার কাছে, যদি ঘুরে আসে তা হলে পাবে।

ফকির খামখানা টেবলের ড্রয়ারে সযত্নে তুলে রাখলো।

তিনি বললেন, আমি নিজের যোগ্যতার কথা ভাবছি রায়বাহাদুর-আমিও তো ওঁর অযোগ্য হ'তে পারি।

অধরনাথ বললেন, কি যে বলেন আপনি।

ডাক্তার রায় বললেন, না রায়বাহাদুর, আমার কথা আপনাকে শুনতে হবে। দেখুন সারজীবন শুধু পড়াশুনো নিয়েই কাটিয়েছি, জীবনে অন্য কোন কথা ভাবি নি। অন্য কিছু জানি না, সাত সমুদ্দুর পার হয়ে বিদ্যে হয়তো কিছু শিখে এসেছি, কিন্তু সাধারণ ব্যাপারে নিজের বাড়ীতেও আমি এখনও একান্ত অসহায়। যাকে বিয়ে করবো তার কাছে আমি বোধহয় ঝঞ্ঝাটের বোঝা ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারবো না। জেনে শুনে এ বোঝা আমি কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাই না।

রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে বললেন, আপনার মত লোকের বোঝা বওয়া যে কোন মেয়ের পক্ষে সৌভাগ্য।

ডাক্তার রায় ভাল করে কিছু ভাবতে পারছিলেন না, এই ক'দিনের সামান্য মেলামেশায় তাঁর নিভৃত মনের স্থির সমুদ্রে ঝড়ের বাতাস যে ওঠেনি একথা বলা যায় না, কিন্তু তাই বলে···

তিনি অসহায় ভাবে, কতকটা নিজের মনে বলে উঠলেন, কিন্তু মঞ্জুর কি মত আছে?

—তার মত? তার কখনও অমত হ'তে পারে? রায়বাহাদুর অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন।

ডাক্তার রায় তবু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, বললেন, না রায়বাহাদুর, তার মতটা তবু জিজ্ঞাসা করা দরকার।

রায়বাহাদুর বললেন, বেশ, আজই জিজ্ঞাসা করুন। এ আর কি!

অধরনাথ বাড়ীর ভিতরে এসে রাজলক্ষ্মীর কাছে কথাটা পাড়লেন। শুনে রাজলক্ষ্মীর মুখ শুকিয়ে গেল।

—বল কি দাদা! মঞ্জু বিয়ে করতে রাজী হবে ডাক্তার রায়কে? তুমি জিজ্ঞাসা করতে বল করছি, কিন্তু আমার মুখ ব্যথাই সার।

—কেন বলতো? ও কি রাজী হবে না মনে হচ্ছে?

—চোখ থাকতে যদি দেখতে না পাও, আমি কি করবো। কদিন ধরে ওর ভাবগতিক লক্ষ করেছ? হাসি নেই, মুখে কথা নেই; দিন রাত যে-মেয়ে দস্যিগিরি করে বেড়াত, বাড়ী থেকে সে বা'র হয় না।

মঞ্জু বাড়ী থেকে বেরোয় না, খেলাধুলো ছেড়ে দিয়েছে। রায়বাহাদুর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন: কই, আমি তো কিছু জানি না। অসুখ বিসুখ কিছু করলো নাকি?

রাজলক্ষ্মী একটা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে বললেন, তুমি কোথা থেকে জানবে বল। এতো বাইরের অসুখ নয়। বুকের ব্যারাম গো, বুকের ব্যারাম।

—বুকের ব্যারাম। মঞ্জুর বুকের দোষ হয়েছে আর তোরা আমায় কিছু জানাস নি, একটা ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকান দরকার মনে করিস নি।

দুশ্চিন্তায়, উত্তেজনায় রায়বাহাদুর চটে উঠলেন।

যে ঘরে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, মঞ্জু আসছিল সেই ঘরেই। পিসিমার কথাগুলো বাইরে থেকেই তার কাণে গেল। তার মুখ গম্ভীর হ'লো, ভিতরে না গিয়ে সে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে রাজলক্ষ্মী বলছিলেন, শোন কথা। ডাক্তার কি করবে। পারো তো সেই জোচ্চোরটাকে ধরে আন, খাতির করে যাকে ঢুকিয়েছিলে। সে গিয়ে অবধি মেয়ে চোখে অন্ধকার দেখছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই—

—তুই কা'র কথা বলছিস? সেই সুজিত?

—হ্যাঁ, গো হ্যাঁ, তোমার সেই পেয়ারের জালিয়াৎ সুজিত। মেয়ে তো তারি জন্যে হেদিয়ে মরছে। ডাক্তার রায়কে বিয়ে করতে রাজী হবে ও? ডাক্তার রায়ের সঙ্গে হেসে দুটো কথা কইতেও তো এ পর্য্যন্ত দেখলাম না!

শেষ কথাটা রাজলক্ষ্মী অবশ্য একটু রং চড়িয়ে বললেন। মঞ্জুর কবল থেকে ডাক্তার রায় উদ্ধার পান, এইটেই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছে, তা হ'লে রমার এগোবার পথটা পরিষ্কার হয়।

রায়বাহাদুর চিন্তিত ভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন, তাই তো, একথা তো ভাবতে পারি নি। আমি যে বড় আশা করেছিলাম ডাক্তার রায়ের হাতে মঞ্জুকে তুলে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হব। কিন্তু ওর যদি এ বিয়েতে মত না থাকে, ও যদি অসুখী হয়....

রায়বাহাদুর অধরনাথ যেন দুস্তর সমুদ্রের মাঝখানে হালহারা ভাঙ্গা নৌকোয় ভাসতে লাগলেন।

বাইরে থেকে মঞ্জু সব কথাই শুনলে। এবার ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে গেল। ঘরের ভেতর মঞ্জুর পিসিমা আবার ঝঙ্কার দিলেন ঃ এখন বোঝ! বেয়াড়া আদর দিয়ে মঞ্জুর মাথাটি খেয়েছ—

—আদর! আদর! তোরা কেবল আদরই দেখছিস! রায়-বাহাদুর আর রাগটা চাপতে পারলেন না ঃ মা-মরা মেয়ে দুটো একটু হেসে খেলে বেড়ায়, তাতেও কি দোষ! কি শাসন ওদের করবো বলতে পারিস? নিজে মা হয়ে তুই ওদের দুঃখ বুঝিস না?

রাজলক্ষ্মীর মন আরও বিষিয়ে উঠলো, গলার স্বর আর এক-পর্দ্দা চড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, তা আমি ওদের দুঃখ বুঝবো কি করে! বাপের বোন পিসি, তাও বিধবা হয়ে তোমার ঘাড়ে পড়ে আছি, আমি হলুম পর। বেশ তো, মেয়ের দুঃখ ঘোচাতে আন না আদর করে সেই জোচ্চোরটাকে ডেকে—

রায়বাহাদুর বললেন, জোচ্চোর কে নয়, অবস্থাগতিকে তাকে জোচ্চোর সাজতে হয়েছিল। আর সে যাই হোক না কেন, আমার মেয়ের সুখের কাছে কোন বিচার আমার নেই, পারলে আমি তাকেই ডেকে আনতাম।...কিন্তু তার খোঁজ কি আর পাব!

রাজলক্ষ্মী আর কিছু বলবার আগেই বাইরে মঞ্জুর হাসির শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্ত্তেই দেখা গেল ডাক্তার রায়কে নিয়ে সে ঘরে ঢুকছে।

বাবা এবং পিসিমাকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে মঞ্জু বলতে লাগলো ঃ জানো বাবা, ডাক্তার রায় এমনি কুণো, ঘর থেকে বেড়তেই চান না।

বিব্রত, লজ্জিত ডাক্তার রায় বললেন, না, আমি—মানে…এই একটু—

মঞ্জু বললে, উনি একলা একখানা বই মুখে করে বসে ছিলেন, আমি জোর করে ধরে এনেছি। ভাল করি নি বাবা?

রায়বাহাদুর আশ্চর্য্য হয়েছিলেন যেমন, খুশীও হয়েছিলেন তেমনি। উৎসাহিত কণ্ঠে তিনি বললেন, নিশ্চয় ভাল করেছ, খুব ভাল করেছ। বুঝেছেন ডাক্তার রায়, রাতদিন বই মুখে করে বসে থাকা অত্যন্ত অন্যায়, কি বলে—স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ।

মঞ্জুর চোখে-মুখে হাসি যেন উছলে উঠছিল, সে রায় বাহাদুরের কাছে এসে বললে, ওঁকে নিয়ে খুব খানিকটা বেড়িয়ে আসবো বাবা? তোমার এখন গাড়ির দরকার নেই তো?

—কিছু না, কিছু না, গাড়ির আবার কি দরকার। আজকাল গাড়ির আমার দরকার হয় না।

—তা হ'লে আমরা কিন্তু সেই সন্ধ্যের আগে আর ফিরছি না, কি বলেন ডাক্তার রায়?

মঞ্জু কৌতুকভরা চোখে ডাক্তার রায়ের দিকে চাইলো। তারপর তাচ্ছিল্যভরা একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো পিসিমার মুখের ওপর।

ডাক্তার রায় বললেন, আর কিছু বলবার আছে বলে তো মনে হয় না।

মঞ্জু আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো এবং তারপর ডাক্তার রায়কে নিয়ে যেন একটা ঝড় তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধরনাথও একবার রাজলক্ষ্মীর দিকে চেয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন। রাজলক্ষ্মীর বুকের ভেতরটা যেন জ্বালা করছিল। মিনিট-খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বললেন, জানি না বাবা, এ আবার কি ঢং!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মঞ্জু ডাক্তার রায়কে বলে, আপনাকে এমন হঠাৎ জোর করে টেনে আনলাম, আপনি কি মনে করছেন কে জানে?

ডাক্তার রায় উত্তর না দিয়ে হাসলেন। দুজনে নিচে নেমে এলো।

মঞ্জু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, আমার ব্যবহার দেখে আপনি খুব আশ্চর্য্য হচ্ছেন, নয়?

—না।

—অবাক হচ্ছেন না? এ রকম অদ্ভুত ব্যবহার। বলা নেই, কওয়া নেই, আপনাকে জুলুম করে ধরে নিয়ে এলাম—

ডাক্তার রায় মঞ্জুর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলেন, বললেন, দেখুন, এই দুদিনে এত কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আমার জীবনে ঘটেছে যে অবাক হ'তে একরকম ভুলেই গেছি।

অর্থাৎ আমাকে অনেক আপদের মধ্যে আর একটা আপদ মনে করছেন। আমি আপনার কাছে আর একটা দুর্ঘটনা মাত্র?

মঞ্জু এমনভাবে ডাক্তারের মুখের দিকে চাইলো যে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। সত্যি, মেয়েদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করাটা তিনি প্রায় ভুলেই গেছেন; কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, না, না, তা নয়। অনেক দুর্ঘটনার মধ্যে স্মরণীয় ঘটনা।...তা যাক্, এখন সহরটা না ঘুরে চলুন বাগানটায় বেড়ান যাক...

—বেশ, তাই চলুন।

দুজনে ওরা বাগানে এল। বাগানে এসে মঞ্জু কিন্তু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। ডাক্তার রায়ের সেটুকু চোখ এড়াল না। খানিক পরে হাসতে হাসতে তিনি বললেন, আমার সঙ্গে বেড়ানটা কিন্তু আপনার পক্ষে একটা শাস্তি। কেন যে এমন খেয়াল হ'ল আপনার।

—বেড়ানটা শাস্তি কেন?

—এই জন্যে যে কোন আনন্দই আপনাকে দিতে পারবো না। দুটো চটকদার কথা বলে' আপনাকে মোহিত করে রাখবো সে ক্ষমতাও নেই। এক যদি বলেন তো দাঁত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দাঁতভাঙ্গা আলাপ করতে পারি—

ডাক্তার রায় হাসবার চেষ্টা করলেন।

মঞ্জু এবার সোজা ডাক্তারের চোখের দিকে চাইলো, তারপর জিজ্ঞাসা করলে, আপনি নিজেকে এত ছোট করে দেখেন কেন?

ডাক্তার রায় জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসলেন।

মঞ্জু আবার বললে, কিম্বা আমাকেই এত খেলো ভাবেন যে মনে করেন, বাইরের চটক দেখেই আমি মুগ্ধ হই, তার বেশী তলিয়ে দেখবার ক্ষমতাই আমার নেই?

—না, না, অমন কথা আমি মোটেই বলিনি। আমার প্রতি অবিচার করবেন না।

—সুবিচার করেই বলছি, বাজে লোকের বাজে কথা শোনার চেয়ে আপনার মত লোকের নীরব সঙ্গ পাওয়াও আমি সৌভাগ্য মনে করি।

ডাক্তার রায় এবার রীতিমত আশ্চর্য্য হয়ে মঞ্জুর মুখের দিকে চাইলেন। ব্যাপার কি? জীবনে নানা জাতের, নানা ধরণের মেয়ের কথা জানবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ তো এমন আকস্মিকভাবে তাঁকে জড়াবার চেষ্টা করেনি? মঞ্জুর এই অতিরিক্ত সৌভাগ্য বোধের হেতুটা কোথায়? একজনকে জোর করে নিজের কাছে ছোট করবার জন্যে আর একজনকে অহেতুক বড় করে তোলার চেষ্টা নয় তো? বাজে লোকের বাজে কথা! কিন্তু বাজে লোকটিই বা কে?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন, শুনে অত্যন্ত বাধিত হলাম। এরকম প্রশংসার খুব জুৎসই একটা জবাব দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল বুঝতে পারছি, কিন্তু····

'কিন্তু' মঞ্জু কৌতুকছলে বললে, ভাষায় কুলোচ্ছে না বলছেন? ভাষার খুব অভাব তো দেখছি না!

—অনেক সময় বোবার মুখেও কথা জোটে, সেটা আপনার সঙ্গের গুণ।

—এবার বোধহয় আমার blush করা উচিত?

—না, না, পরিহাস করবেন না। সত্যি আপনার প্রশংসার প্রশ্রয় পেয়েই আজ আমার যেন সাহস বেড়ে গেছে এবং এই সাহস থাকতে থাকতেই আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—

মঞ্জু কিছু না বলে ওঁর মুখের দিকে চাইলো। ডাক্তার রায় কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন। মঞ্জু বললে, কি চুপ করে রইলেন যে? সাহস কি ফুরিয়ে গেল এর মধ্যে? ডাক্তার রায় একটা ঢোক গিললেন।

—না, না, কি করে কথাটা পাড়বো ঠিক বুঝতে পারছি না। অথচ এ-বিষয়ে আপনার মতামত জানা আমার একান্ত দরকার?

মঞ্জুর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সে মুহূর্তের জন্যে ডাক্তার রায়ের মুখের দিকে চেয়ে স্থির কণ্ঠে বললে, কথাটা পাড়বার চেষ্টায় আপনাকে আর বিব্রত হ'তে হবে না ডাক্তার রায়! আপনি কি বলতে চাইছেন আমি জানি।

ডাক্তার রায় বিস্মিত হয়ে মঞ্জুর দিকে চাইলেন।

মঞ্জু বললে, আমার মতামত যদি আপনার কাছে এত দামী হয় তা হ'লে শুনুন, আমার এ বিয়েতে সম্পূর্ণ মত আছে।

—মত আছে! আমার এ সৌভাগ্য যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না মিস চ্যাটার্জী।

ডাক্তার রায় অকপট ভাবেই কথাটা বললেন, কিন্তু মঞ্জু হঠাৎ যেন কেঁপে উঠলো।

—কেন বিশ্বাস করতে পারছেন না? কেন বলতে পারেন? আমার এ বিয়েতে মত দেওয়া কি এমন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার? আমি কি এমন একটা অসাধারণ মেয়ে যে শুধু রূপকথার রাজপুত্রের আশাতেই পথ চেয়ে থাকবো। রূপকথার রাজপুত্রদেরও আমি জানি—সে আলেয়ার চেয়ে সামান্য একটু আলোর দাম আমার কাছে অনেক বেশী; অনেক বেশী।

শেষের দিকে মঞ্জুর গলার স্বর প্রায় কান্নার মত শোনাল এবং কথা শেষ করেই সে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাগান থেকে বেরিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

ডাক্তার রায় স্তম্ভিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাজে লোকের বাজে কথা আর রূপকথার রাজপুত্রের আশায় পথ চেয়ে থাকা। অত্যন্ত হঠাৎ, অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্যুতের ঝিলিকের মত ডাক্তার রায়ের মনে হোলো, এ দুটোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ একটা যোগ রয়েছে। কথা যত বাজে হোক, রাজপুত্র নিশ্চয়ই। আলেয়া হোক, তবু আলোকচ্ছটা ; তার কাছে সামান্য আলোর দাম কতটুকু।

রাজপুত্রটিকে চিনতে ডাক্তার রায়ের দেরী হলো না।

রায়বাহাদুর তাঁর ঘরে ডাক্তার রায়ের জন্য উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

ডাক্তার রায় ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, আসুন আসুন। আজ আমার কি আনন্দের দিন।

ডাক্তার রায় মনস্থির করেই ঘরে ঢুকেছিলেন, রায়বাহাদুরের কথার জবাবে একটু হাসলেন মাত্র।

রায়বাহাদুর আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন : আমি তখনই বলেছিলাম মঞ্জুর মতের জন্যে ভাবনা নেই, বলুন আর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার দরকার আছে ?

—না, তাঁর মত আমি জেনেছি।

—জেনেছেন। তা হ'লে আর দেরী করবার দরকার তো নেই। ওঃ। কতবড় ভার যে আমার মন থেকে আজ নেমে গেল। জানেন না ডাক্তার রায়, আজ আমার কি আনন্দের দিন···

ডাক্তার রায় একটু ভেবে নিয়ে বললেন, কিন্তু একটু দেরী করতে হবে রায়বাহাদুর। আমি একবার কলকাতায় ফিরছি।

—বেশ তো। আমিও মঞ্জুদের নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই যাচ্ছি। আমার তো ইচ্ছে সেইখানেই—

—সে ভাল কথা। কিন্তু তার আগে আমার একটা কাজ না করলেই নয়।

—কি বলুন তো ?

—সুজিতবাবুকে আমার খুঁজে বার করতে হবে।

—সুজিত কে? সেই হতভাগা, অপদার্থ, ভবঘুরে—

—হ্যাঁ রায়বাহাদুর, সেই হতভাগা অপদার্থ ভবঘুরেটাকেই আমার খুঁজে বা'র করা একান্ত দরকার। তাকে না পেলে আমাদের এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হবে না।

রায়বাহাদুরকে আর কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে ডাক্তার রায় নিজের ঘরে চলে এলেন।

রাত্রিতে রায়বাহাদুর তাঁকে আরও দু' একটা দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফেরবার জন্যে বারম্বার অনুরোধ করলেন। কিন্তু ডাক্তার রায়কে আর আটকে রাখা গেল না। পরদিন সকালের ট্রেনেই তিনি কলকাতা রওয়ানা হলেন।

কলকাতায় এসে ডাক্তার রায় বেকার সঙ্ঘের অফিসটা অতিকষ্টে খুঁজে বার করলেন। সেখানে কিন্তু সুজিত বা ফকিরকে পাওয়া গেল না। খবর পাওয়া গেল যে সুজিত কিছুকাল আগে সঙ্ঘের মায়া কাটিয়েছে, তবে ফকির এখনও আসে যায়। ফকিরের নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে ডাক্তার রায় হতাশ মনে ফিরে এলেন।

দিন দুই পরে ফকির ডাক্তার রায়ের ক্লিনিকে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে। কিন্তু তার কাছেও সুজিতের খোঁজ পাওয়া গেল না।

ডাক্তার রায় ভাবনায় পড়লেন; বললেন, কি আশ্চর্য্য! আপনিও সুজিতবাবুর কোন খবর রাখেন না!

—আজ্ঞে না, সেই বেকার সঙ্ঘ ছেড়ে যাওয়ার পর থেকেই একেবারে নিরুদ্দেশ। চেষ্টা আমি কম করিনি মশাই, কিন্তু তার কোন পাত্তাই পেলাম না।

—আচ্ছা এরকম অজ্ঞাতবাসের কারণটা কি বলতে পারেন?

—উহুঁ। এতকাল মেলামেশা করছি, এরকম তো কখনও দেখি নি।

ডাক্তার রায় অস্থির ভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তারপর গোবিন্দর দিকে চেয়ে বললেন,—তাই তো! বড় মুস্কিলই তা হলে হোলো দেখছি। সুজিতবাবুকে খুঁজে বা'র করবার কোন উপায়ই তো দেখছি না গোবিন্দ।

গোবিন্দও ভাববার চেষ্টা করছিল, সে বললে, আজ্ঞে না। উপায় কিছু দেখছি না।

ডাক্তার রায় বিরক্ত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলেন, তারপর বললেন, তোমায় আমি উপায় খুঁজে বার করতে বলিনি বাপু।

—আজ্ঞে?

—কোন পেশেণ্ট বাকী আছে দেখতে? থাকে তো ডাক।

—গোবিন্দ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ আছে।

—আছে তো নিয়ে এসো।

গোবিন্দ বেরিয়ে রোগীরা যেখানে অপেক্ষা করে সেই ঘরে গেল। ডাক্তার রায় তেমনি পায়চারী করতে লাগলেন। সুজিতকে না পেলে তাঁর সব চেষ্টাই যে মাটি হয়ে যাবে, কিন্তু তাকে খুঁজে বার করবার আশাও আর আছে বলে মনে হয় না। তা হ'লে কি....

গোবিন্দ রোগী নিয়ে ফিরে এল।

ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা ক্ষীণকায় একটি লোক। লোকটি ঢুকলো হাত জোড় করে, যেন কোন অনুগ্রহ চাইছে ডাক্তার রায়ের কাছে। ডাক্তার রায় নিজের চিন্তায় ডুবে ছিলেন, লোকটির দিকে ভাল করে লক্ষ্যও করলেন না, সোজা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন দাঁত তোলার চেয়ারে।

লোকটি কি যেন বলবার চেষ্টা করছিল, ডাক্তার রায় চেয়ারের সঙ্গে তার মাথাটা ঠিক করে সেট্ করে, মাথার উপরের আলোটা খানিকটা নামিয়ে এনে বললেন, হাঁ করুন।

লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে হাঁ করলো। ডাক্তার রায় অভিনিবেশ

সহকারে তাকে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু কোন উপসর্গই চোখে পড়লো না। বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে আপনার? বত্রিশ পাটি দাঁতই তো পরিপাটি রয়েছে দেখছি।

লোকটিও বেশ বিব্রত এবং আশ্চর্য্য হয়েছিল, সে প্রায় দমবন্ধ করে জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ মানে? দাঁতে ব্যথা-টেথা আছে?

—আজ্ঞে না।

ডাক্তার রায় আশ্চর্য্য এবং বিরক্ত হয়ে বললেন, তবে কি সখ করে দাঁত দেখাতে এসেছেন!

লোকটি বললে, আজ্ঞে না, এসেছি অনেক দুঃখে। দাঁত আছে তবু চিবোতে পারি না।

—দাঁত আছে তবু চিবোতে পারেন না। বলেন কি?

সমস্ত দন্তচিকিৎসা-শাস্ত্র মনে মনে মন্থন করবার চেষ্টা করলেন ডাক্তার রায়, কোথাও এরকম অসুখের নজীর পাওয়া গেল না।

লোকটি খুব কুণ্ঠিত ভাবে বললে, আজ্ঞে খেতে না পেলে চিবোই কি করে বলুন? দয়া করে যদি একটা চাকরী দেন—

—চাকরী? আপনি দাঁত দেখাবার নামে চাকরী চাইতে এসেছেন? আপনি চাকরী চান?

—আজ্ঞে চাকরী কে না চায়। আর চাকরীর জন্যে কি না করা যায় বলুন।

লোকটার কথা শুনতে শুনতে ডাক্তার রায় যেন নতুন করে কি ভাবতে সুরু করেছিলেন। তিনি কতকটা নিজের মনেই বললেন, চাকরী—চাকরী কে না চায়—না?

হঠাৎ ফকিরের দিকে চেয়ে উৎসাহিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, হয়েছে ফকিরবাবু, হয়েছে। এবার সুজিতবাবুকে আমি নির্ঘাৎ খুঁজে পেয়েছি।

ফকির কিছুই ভাল করে বুঝতে পারছিল না, এর মধ্যে সুজিত চক্রবর্ত্তী এল কখন! সে জিজ্ঞাসা করলে; কোথায়?

ডাক্তার রায় বললেন, কোথায় আবার! এইখানে, এইখানে।

রোগীকে ছেড়ে তিনি নিজের টেবলে এসে বসলেন, প্যাড্‌টা টেনে নিয়ে কলম বা'র করে খস্‌ খস্‌ করে কি লিখতে লাগলেন। ফকির কৌতুহল চাপতে না পেরে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো। দেখলো ডাক্তার রায় লিখছেন : কর্ম্মখালি—বিশেষ কাজের জন্য শিক্ষিত, কর্ম্মঠ একজন ভদ্র যুবক দরকার—যোগ্যতানুসারে উপযুক্ত বেতন দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত করুন।

বিস্ময়ে ফকিরের চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল, সে বললে, এ ত বিজ্ঞাপন!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন বুঝতে পারছেন না, সুজিত-বাবুর যদি সত্যি চাকরীর দরকার থাকে তা হলে এ বিজ্ঞাপনে তাঁকে সাড়া দিতেই হবে, তাঁর একখানা দরখাস্ত আমি পাবই।

কথামত কাজ করতে ডাক্তার রায় দেরী করলেন না। সেই-দিনই গোবিন্দকে দিয়ে খবরের কাগজগুলোয় বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন থেকে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হ'তে লাগলো এবং তার দিন দুই পর থেকে সুরু হলো দরখাস্ত আসতে। রাশি রাশি লেফাফায় দেরাজ, টেবিল সব ভর্ত্তি হ'বার উপক্রম হোলো। ব্যাপার দেখে ডাক্তার রায় বললেন, এ যে গোটা বাংলা দেশটাই দরখাস্ত করে ফেলেছে দেখছি।

গোবিন্দ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হবে বইকি।

ফকির আর গোবিন্দর সাহায্যে ডাক্তার রায় চিঠিগুলো বাছাই সুরু করলেন। নানা জায়গা থেকে নানা লোকের দরখাস্ত। কিন্তু যার জন্যে টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দেওয়া তার নামটা কোন দরখাস্তের নিচে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ডাক্তার রায় বললেন, না, আর কোন আশা নেই। তুমি কিছু পেলে হে?

গোবিন্দ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ পেয়েছি। সুজিত বোস, সুজিত দাস—

ডাক্তার রায় বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, দাস-বোস দিয়ে কি করবো। চক্রবর্ত্তী চাই।

ফকির বললে, আজ্ঞে আমি চক্রবর্ত্তী পেয়েছি। এই যে হরিপদ চক্রবর্ত্তী।

ডাক্তার রায় বললেন, তবে আর কি! ল্যাজা-মুড়ো কেটে একসঙ্গে জুড়ে দাও, সব ঝঞ্ঝাট চুকে যাক্।

নিরাশ হয়ে তিনি উঠে পড়লেন। একখানা খাম তার শার্টের হাতার সঙ্গে কি রকম করে লেপটে গিয়েছিল, তিনি উঠে দাঁড়াতেই সেটা ঠক করে টেবিলের উপর পড়লো। এখানা আগে চোখে পড়েনি, ডাক্তার রায় খুলে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তে তাঁর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি প্রায় চীৎকার করে উঠলেন: পেয়েছি, পেয়েছি!

সবাই আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর দিকে চাইলো। তিনি আবার বললেন, এই তো পেয়ে গেছি।

কি পেয়েছেন, কাকে পেয়েছেন, এসব প্রশ্নের মীমাংসা হবার আগেই মঞ্জুকে নিয়ে রায়বাহাদুর সেখানে উপস্থিত হ'লেন। ডাক্তার রায়ের কথাটা রায়বাহাদুরের কানে গিয়েছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি পেয়েছেন ডাক্তার রায়?

ডাক্তার রায় বিব্রতভাবে বললেন, এই যে আপনারা এসেছেন। আমি দেখতে পাইনি।

মঞ্জু হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ, আপনি একটু উত্তেজিত ছিলেন।

—ব্যাপার কি ডাক্তার রায়? রায়বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন।

—ডাক্তার রায় বললেন, ব্যাপার এমন কিছু নয়। তারপর, আপনারা কলকাতায় এলেন কবে?

জবাব দিলেন রায়বাহাদুর: কাল এলাম মঞ্জুকে নিয়ে—আপনার তো কোন সাড়া শব্দ নেই। তাই বেড়াতে বেড়িয়ে ভাবলাম একবার খোঁজটা নেওয়া দরকার—তা আপনি তো খুব ব্যস্ত দেখছি।

না, মানে ব্যস্ত আর কি।

তবু আমরা এখন চলি, কাল বিকেলে কিন্তু আমার ওখানে আপনার যাওয়া চাই। ওইখানেই চা খাবেন। এই আমাদের ঠিকানা—

রায়বাহাদুর কার্ড বার করে ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার রায় কার্ডটা হাতে নিয়ে কি যেন ভাবলেন। ভাবছিলেন তিনি গোড়া থেকেই, মানে, মঞ্জু আর রায়বাহাদুরের আবির্ভাবের পর থেকেই। এবার একটু বেশী করে ভাবলেন। তারপর বললেন, না রায়বাহাদুর, কাল বিকেলে আপনাদেরই চায়ের নেমন্তন্ন রাখতে হবে আমার এখানে।

রায়বাহাদুর বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কেন বলুন তো?

ডাক্তার রায় বললেন, এখন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, তবে একটা কিছু আশ্চর্য্য ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন।

আশ্চর্য্য ঘটনাটা যে কি হতে পারে সেটা রায়বাহাদুর কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা বেশ, তাহ'লে আমরা এখন চলি।

—এসেই চলে যাবেন? একটু বোসবেন না? ডাক্তার রায় বললেন।

জবাব দিলে মঞ্জু: আপনার এখানে বসা নিরাপদ মনে হচ্ছে না। হঠাৎ যদি দাঁত তুলে দেন।

হাসতে হাসতে সে রায়বাহাদুরের সঙ্গে চলে গেল। ডাক্তার রায় ওদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। তারপর ফকির চাঁদকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন, এই ছাখ সুজিত চক্রবর্তীর দরখাস্ত। এখুনি তাকে চিঠি লিখে দাও। কাল বিকেলেই যেন চাকরীর জন্য দেখা করতে আসে। ঠিক বিকেল চারটা, রায়বাহাদুর ওই সময়েই আসছেন।

ফকির চিঠি লিখতে ছুটলো।

পরদিন বিকেল। চারটে বাজতে আর মিনিট কয়েক বাকি।

ডাক্তার রায়ের ক্লিনিকে ভিজিটার্স-রুমে মঞ্জু আর রায়বাহাদুর বসে। চা-জলখাবার আগেই দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো শেষ হয়েও এসেছে। ডাক্তার রায় কিছুক্ষণ থেকে একদৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে চেয়ে কি ভাবছিলেন, হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করলে, এত ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন কেন ডাক্তার রায়?

ডাক্তার রায় প্রায় চমকে উঠে বললেন, ও! ঘড়ি দেখছি বুঝি! এই মানে দেখছিলাম কটা বাজে—

—আমি কিন্তু ভাবলাম বুঝি আপনার আশ্চর্য্য ঘটনার সময় হয়ে এলো। মঞ্জু বললে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি কি যেন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাবেন বলেছিলেন ডাঃ রায়? রায়বাহাদুরও কৌতুহলী হয়ে উঠলেন।

ডাক্তার রায় আরও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি এতক্ষণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলেন সুজিত চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাবের জন্য। সুজিতকে মঞ্জু আর রায়বাহাদুরের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়। কিন্তু কোথায় সেই বেকার, বাউণ্ডুলে সুজিত? চাকরী নিশ্চিত জেনেও যে এলো না।

রায়বাহাদুরের কথার জবাবে ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছিলাম। এখনও আশা করছি যে কথা রাখতে পারবো। ক্ষমা করবেন, আমি এখুনি আসছি...

বলতে বলতে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন।

সেখানে ফকিরচাঁদ অপেক্ষা করছিল। ডাক্তার রায় বললেন, ব্যাপার কি বলুন তো? চারটে বাজে, এখনও যে সুজিতবাবুর দেখা নেই!

ফকির বললে, আমি একটু এগিয়ে দেখব নাকি?

ডাক্তার রায় বিমর্ষমুখে বললেন, এগিয়ে আর কি দেখবেন। তিনি এগিয়ে না এলে দেখবেন কাকে ?

—তবু আমি না হয় একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। বাড়ী চিনতে হয়তো ভুল হ'তে পারে।

—বেশ তাই দাঁড়ান। কিন্তু আগে থাকতে যেন সব কথা তাঁর কাছে ফাঁস করে ফেলবেন না, দেখবেন।

ফকির বিজ্ঞতার হাসি হেসে বললে, না, না, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি অতটা আহাম্মুক নই।

ফকির এসে রাস্তায় দাঁড়াল। ট্রাম রাস্তার ধারেই ডাক্তার রায়ের ক্লিনিক।

ট্রাম থেকে লোক নামলেই ফকিরের বুক ধড়াস করে ওঠে, এই বুঝি সুজিত এলো! পরমুহূর্তে নিরাশায় তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এমনি মিনিট পনের অপেক্ষার পর সত্যি সুজিতকে ট্রাম থেকে নামতে দেখা গেল। রাস্তা পার হয়ে ফুটপাতে উঠে সুজিত বাড়ীর নম্বর খুঁজতে লাগলো।

ফকির তাকে দেখতে পেয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে বললে, আর খুঁজতে হবে না, চলে এসো।

সুজিত ফকিরকে দেখে রীতিমত আশ্চর্য্য হয়েছিল; বললে, আরে ফকিরচাঁদ যে! তুমি এখানে কি করছো ?

ফকির একমুখ হেসে বললে, এই তোমার জন্যে হা পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছি।

—আমার জন্যে ? বল কি ? তুমি জানলে কোথা থেকে ?

—এত ফন্দি-ফিকির করে তোমায় বার করা হোলো আর আমি জানবো না! ফকির বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে : এখন চলো দেখি তাড়াতাড়ি, ওঁরা সবাই অপেক্ষা করে বসে আছেন।

সুজিত আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল, বললে, ওঁরা আবার কে হে ?

ফকির আবার একটু মুরুব্বিয়ানার হাসি হেসে বললে, কে আবার! জানো না যেন! আরে রায়বাহাদুর আর তাঁর মেয়ে।

ডাক্তার রায় আজ ওঁদের নেমন্তন্ন করে আনিয়েছেন যে, তোমায় হঠাৎ হাজির করে তাঁদের একেবারে অবাক করে দেবেন বলে।

বলতে বলতেই ফকিরের মনে পড়ে গেল যে ডাক্তার রায় তাকে এসব কথা সুজিতকে বলতে মানা করে দিয়েছিলেন; ফকিরের মুখ শুকিয়ে গেল, সে জিভ কামড়ে বললে, ওই যা!

—কি হ'ল কি?

—ডাক্তার রায়ের মানা ছিল, তোমায় যে সব বলে ফেললাম।

সুজিত সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে একবার ভাল করে ভেবে নিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ডাক্তার রায় তাকে চাকরী দেবার লোভ দেখিয়ে এতদূর টেনে এনেছেন, চাকরী দেবার জন্যে নয়, মঞ্জুদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যে। তিনি ভেবেছেন, সুজিত চক্রবর্ত্তী মঞ্জু-বিহনে মারা যেতে বসেছে। কিন্তু সুজিত অত দুর্ব্বল প্রাণ নিয়ে জন্মায় নি। আগে তাকে আত্ম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তারপর ওসব স্বপ্ন দেখার সময় পাওয়া যাবে ঢের। কিন্তু ডাক্তার রায়ের যদি সত্যি তাকে চাকরী দেবার ইচ্ছা থাকে? এমনও তো হ'তে পারে যে মঞ্জুরা নিতান্তই হঠাৎ আজ এখানে এসেছে। সুতরাং সামান্য একটা মেয়েকে এড়াবার জন্যে বেকারত্ব মোচনের এত বড় একটা সুযোগ ছাড়া কি উচিত হবে? চিরকালের এডভেঞ্চার-প্রিয় মানুষটা বলে উঠলো: না, না, একবার গিয়ে আসল ব্যাপারটা দেখতে ক্ষতি কি? মঞ্জুকে এড়ানই যদি দরকার হয় তা হ'লে সামান্য একটু ছদ্মবেশই কি তার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

একটু চুপ করে থেকে সে ফকিরের কানে কানে কি বললো। তারপর ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্রাম ধরে তা'তে উঠে পড়লো।

ফকিরচাঁদ ফিরলো ক্লিনিকের দিকে।

এদিকে সেই আশ্চর্য্য ঘটনার অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে রায়বাহাদুর অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, মঞ্জুও রীতিমত বিরক্ত হয়ে

পড়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত মঞ্জু বললে, নাঃ, আর অপেক্ষা করা যায় না ডাক্তার রায়। আপনার আশ্চর্য্য ব্যাপার আশ্চর্য্য রকম 'লেট' বলতে হবে।

—আর একটু বসুন, আমার অনুরোধ।

ডাক্তার রায়ের কাতর কণ্ঠে রায়বাহাদুর কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, বললেন, না, না, অনুরোধ করবার কি দরকার। বেশতো আমরা বসে আছি, আরও না হয় খানিক—কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?

মঞ্জু হাসতে হাসতে বললে, ব্যাপারটা বলে ফেললে আর আশ্চর্য্য থাকবে না যে!

—তাই তো বটে! রায়বাহাদুর বললেন—আচ্ছা আর খানিক বসাই যাক তা হ'লে, আমাদের কোন কষ্ট তো আর নেই।

এই সময় গোবিন্দ এসে একটা 'শ্লিপ' দিল ডাক্তার রায়ের হাতে। কাগজটা পড়তে পড়তে ডাক্তার রায় বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। শ্লিপে সুজিত চক্রবর্ত্তীর সই! এতক্ষণে তাঁর প্রতীক্ষা সফল হোলো। সুজিতকে ভেতরে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন তিনি গোবিন্দকে। তারপর মঞ্জুর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার এবার আপনারা সত্যি দেখতে পাবেন। জানেন কাকে এত দিনে খুঁজে বার করেছি? কে এখন দেখা করতে এসেছেন জানেন?

আসল ব্যাপারটা রায়বাহাদুর বা মঞ্জু কেউই অনুমান করতে পারেনি। ওরা দুজনেই প্রশ্ন করলে: কে?

ডাক্তার রায় বিজয়গৌরব-প্রদীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, সুজিত চক্রবর্ত্তী।

রায় বাহাদুর বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, সুজিত চক্রবর্ত্তী! মঞ্জু কিছু বললো না, শুধু একটা বাঁকা চাহনি নিক্ষেপ করলো ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার রায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে দরজার দিকে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিনিটখানেক পরে যে লোকটি দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো তার দিকে চেয়ে মাথা প্রায় ঘুরে গেল। সুজিত চক্রবর্ত্তী নয়, দাড়ি

গোঁফওলা একটা লোক—পাঞ্জাবী গোছের। ডাক্তার রায় যে মস্ত ভুল করেছেন সেটা বোঝাবার জন্যেই মঞ্জু বোধহয় ব্যঙ্গের হাসি হেসে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

বিস্ময়ের ঘোরটা একটু ফিকে হ'তে ডাক্তার রায় আগন্তুকের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কে? এখানে কি জন্যে?

সুজিত ধরা না দেবার জন্যে সর্ব্ব রকমে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। সহজভাবে কথা বললে পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'তে পারে, তাই তোতলামী সুরু করলে; আজ্ঞে···আ—আমি—সু—সু—সু—সুজিত—চ—চক্কোত্তি। আ—আপনার চি—চিঠি পেয়ে দে—দে—দেখা কত্তে···

—আপনি সুজিত চক্রবর্ত্তী?

—আ—আজ্ঞে, বরাবর ও—ওইটেই আ—আমার না—না—নাম। তা—প—পছন্দ না হয় ব—ব—ব—বদলে দেব।

—না, না, নাম পাল্টাতে আমি বলিনি। কিন্তু···

ডাক্তার রায়ের মনে হ'লো তিনি একটা ভাঙা নৌকোয় ভাসছিলেন, এবার সেটাও তলিয়ে যাচ্ছে! সুজিত চক্রবর্ত্তী নামে সংসারে কত লোক আছে, দরখাস্ত করলেই তাকে বেকার শঙ্ঘের ভূতপুর্ব্ব সেক্রেটারী বলে মনে করে নিতে হবে এ কি কথা! এমন ভুল তাঁর হোল কি করে।

মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ধন্যবাদ ডাক্তার রায়! সত্যি আশ্চর্য্য করে দিয়েছেন।—চল বাবা আমরা যাই। ডাক্তার রায় এখন বোধহয় ব্যস্ত থাকবেন।

—ডাক্তার রায় প্রায় আর্ত্তকণ্ঠে বললেন, কিছু মনে করবেন না মিস্ চ্যাটার্জ্জী। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

মঞ্জু ব্যাপারটা কতকটা অনুমান করেছিল, রায়বাহাদুর কিন্তু কিছুই অনুমান করতে পারেন নি। তিনি একবার ডাক্তার রায়ের মুখের দিকে, একবার মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আমি যে এর কিছুই বুঝতে পারছি নে।

মঞ্জু বললে, বোঝবার চেষ্টা করলে আরও আশ্চর্য হবে বাবা। চলো আমরা যাই।

রায়বাহাদুর উঠতে উঠতে বললেন, বেশ, তাই চলো। আপনি কিন্তু ডাক্তার রায় আমাদের ওখানে আসচেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যাব বইকি।

ডাক্তার রায় যেন স্বপ্নের ঘোরে জবাব দিলেন।

রায়বাহাদুরকে নিয়ে মঞ্জু বেরিয়ে গেল। আর দুজনের মত মঞ্জুও সুজিতকে চিনতে পারে নি। ডাক্তার রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, দাড়ি গোঁফওলা এই লোকটাকে নিয়ে এখন কি করা যায়।

চেয়ারে বসে ডাক্তার রায় গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

সুজিত এগিয়ে এলো তাঁর কাছে, বললে, খুব কি হতাশ হয়েছেন ডাঃ রায়?

এবার সে স্বাভাবিক কণ্ঠে, সহজভাবে কথা বলেছিল। ডাক্তার রায় চমকে উঠে তার মুখের দিকে চাইলেন, বললেন, আপনি।

সুজিত হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ আমিই আসল, আমিই নকল, আমিই সত্য, আমিই মায়া। কি রকম ছদ্মবেশটা হয়েছে বলুন দেখি?

ডাক্তার রায় খুশী হ'তে পারলেন না। রায়বাহাদুর আর মঞ্জুর কাছে খেলো হওয়ার রাগে তিনি যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলেন; বললেন, খাশা হয়েছে মশাই, খাশা হয়েছে। কিন্তু এ ছদ্মবেশের মানে কি বলতে পারেন? এ চালাকীর অর্থ?

—তা হ'লে আমার সঙ্গে আপনার চালাকিটার অর্থ কি জানতে পারি?

—আপনার সঙ্গে আমার চালাকি!

—চালাকি নয়? চাকরীর চার ফেলে আমায় ধরে এনে সকলের সামনে হাস্যাস্পদ করতে চেয়েছিলেন। আপনার সেই ফন্দি আমি ব্যর্থ করেছি মাত্র।

ডাক্তার রায় ব্যথা পেলেন সুজিতের কথায়। যার জন্যে তাঁর এত চেষ্টা সেই তাঁকে ভুল বুঝলো। আঘাতটা তিনি নীরবেই সহ্য করলেন, একটু চুপকরে থেকে বললেন, খুব ভাল কাজ করেছেন। কিন্তু এরকম চালাকি করে ধরে আনায় আমার কোন স্বার্থ আছে বলতে পারেন?

—নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্যটাও তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

—উদ্দেশ্য আপনাকে খুঁজে বার করা এবং তাও আমার নিজের স্বার্থের জন্যে নয়।

সুজিত আশ্চর্য্য হয়ে বললে, আমার মত হতভাগা বেকার বাউণ্ডুলেকে শুধু শুধু খুঁজে বার করার গরজ কার হ'তে পারে?

—কার গরজ হ'তে পারে তাকি আপনি এখনও জানেন না? আপনি কি কিছু বোঝেন নি?

ডাক্তার রায় স্থির দৃষ্টিতে সুজিতের মুখের দিকে চাইলেন, তারপর বলতে লাগলেন: শুনুন সুজিতবাবু, মিথ্যা অভিমানের বশে জোর করে জীবনে দুঃখ টেনে আনবেন না। রায়বাহাদুর আর মঞ্জুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে ফন্দী করে এখানে এনেছিলাম, তাতে আপনি আমায় হাস্যাস্পদ করেছেন। তাতে আমার কোন ক্ষতি নেই। এখন তাঁদের সঙ্গে সহজভাবে দেখা করবেন চলুন।

—ক্ষমা করবেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না।

—কোন প্রয়োজন দেখেন না? রায়বাহাদুর আপনাকে কত স্নেহ করেন জানেন। মঞ্জুর মনের কথা কি আপনি কিছুই বোঝেন নি?

তাদের চলে আসার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রংপুর ষ্টেশনে মঞ্জুর আবির্ভাবের কথা মনে পড়লো সুজিতের। তবে কি?……কিন্তু না, সে শুধু কল্পনা।

সুজিত বললে, এসব কোন কথাই আমি বুঝতে চাই না ডাঃ রায়। ও আকাশ-কুসুমে আমার লোভ নেই।

ডাঃ রায় আর একটা আঘাত পেলেন। তাঁর সব ধারণাই কি ভুল? সত্যি যদি ভুলই হয় তা হলে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে ক্ষতি কি? এতদূর যখন এগিয়েছি, তখন আরও একটু অগ্রসর হওয়া যাক।

সুজিত বললে, আচ্ছা নমস্কার, আমি চললুম।

দাঁড়ান, যাচ্ছেন কোথায়?

সুজিত যেতে যেতে ফিরে দাঁড়াল। ডাক্তার রায়ের মুখ দেখে মনে হোলো তিনি কিছু একটা স্থির করে ফেলেছেন। তিনি বললেন আসল কাজের কথাই যে বাকী।

—আসল কাজ? সুজিত আশ্চর্য্য হোলো।

—হ্যাঁ, যার জন্যে আপনাকে আনা হয়েছিল।

—ডাকা হয়েছিল তো চাকরীর নাম করে।

—সেই চাকরীই আপনাকে দেওয়া হবে। আপনি করতে রাজী আছেন, না চাকরী খোঁজা আপনার একটা ভাণ?

—ভাণ হ'লে কি আমার দরখাস্ত পেতেন? একটা কাজ দিয়েই তো পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। যে কোন কাজ দিয়ে দেখুন—বড় বা ছোট যে কোন কাজ, তাতে যদি আমার গাফিলতি দেখেন তখন যা খুশী তাই বলতে পারেন।

—যে কোন কাজ করতে তা হ'লে আপনি প্রস্তুত?

—নিশ্চয়।

—তা হ'লে যে কোন কাজ আপনাকে দেওয়া যেতে পারে। কি বলুন!......আচ্ছা, আপনি গাড়ি চালাতে পারেন?

—পারি।

—বেশ আজ থেকে আপনার কাজ—আমার গাড়ি চালাবেন। আপত্তি আছে!

—কিছু মাত্র না।

ডাক্তার রায় একটু চুপ করে থেকে আরও কি যেন মনে মনে স্থির করে ফেললেন, তারপর বললেন, শুনুন, আর একটা কথা।

আপনাকে এই চেহারাতেই ড্রাইভারী করতে হ'বে। ছদ্মবেশটা বদলালে চলবে না।

—এই চেহারায়? সুজিত আরও বেশী আশ্চর্য্য হোলো।

—হ্যাঁ এই চেহারায়। যে চেহারা নিয়ে আপনি চাকরী খুঁজতে এসেছেন আমি শুধু সেই চেহারাই চিনি। আপনার অন্য কোন চেহারা আমি মানবো কেন? সুজিত ডাক্তার রায়ের মতলবটা ঠিক ধরতে পারলো না। কিন্তু লোকটিকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করতো, খুব খারাপ কোন উদ্দেশ্য যে তাঁর থাকতে পারে এ কথা সে বিশ্বাস করতে পারলো না। তা ছাড়া, অভাবটা তার বর্ত্তমানে একেবারে চরম সীমায় পৌঁছেচে। এ সময় যদি সত্য একটা চাকরী পাওয়া যায় সেটা সে ছাড়বে কোন্ সাহসে? ছদ্মবেশে থাকাতে তার সুবিধেও তো কম নয়, জানাশুনো লোকের কাছে অন্ততঃ চক্ষুলজ্জায় পড়তে হবে না।

সুজিত ডাক্তার রায়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

ডাক্তার রায় বললেন, আপনার কাজ কিন্তু আজ থেকেই সুরু। আজ মানে এখনই। যান, গ্যারেজে গিয়ে গাড়ি বা'র করুন। রায়বাহাদুরের বাড়ী যেতে হবে।

—রায় বাহাদুরের বাড়ী?

না, না, সুজিতের পক্ষে সেটা অসম্ভব। ডাক্তার রায় যদি মঞ্জুকে নিয়ে হাওয়া খেতে যান তা হ'লেও কি সুজিতকে গাড়ি চালাতে হবে না কি? অসম্ভব।

সুজিত প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। ডাক্তার রায় গম্ভীর মুখে বললেন, সুজিতবাবু, strict obedience। চাকরী করতে এসে প্রশ্ন প্রতিবাদ চলবে না। আমি ওগুলো পছন্দ করি না।

মহাসমস্যায় পড়লো সুজিত। একদিকে মান মর্য্যাদা, হৃদয়ঘটিত দুর্ব্বলতা, আর একদিকে জীবনে প্রথম বেকারত্ব মোচনের সুযোগ।

জলের চেয়ে রক্ত গাঢ়। চাকরীর মোহ সুজিত ছাড়তে পারলো না। ডাক্তার রায়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে গাড়ি বা'র করতে গেল।

ডাক্তার রায় মনে মনে হাসলেন।

কলকাতায় মঞ্জুর কিছুই ভাল লাগছিল না। রংপুরের বাড়ীতে তবু দিবারাত্রি ছুটোছুটি, মায়ার সঙ্গে খুনসুটি, ঘোড়ায় চড়া এবং আরও পাঁচটা বাজে কাজ নিয়ে সময় কাটাবার উপায় ছিল, কিন্তু এখানে হয় চুপ করে বাড়ীতে বসে থাকা, নয়তো বড় জোর মোটরে চড়ে সিনেমায় যাওয়া, এ ছাড়া কিছুই করবার নেই। মঞ্জু হাঁফিয়ে উঠলো। রায় বাহাদুরকে বললে, আর কতদিন কলকাতায় থাকবে বাবা? আমার ভাল লাগছে না।

রায়বাহাদুর বললেন, সে কি মা? এই তো সবে এসেছি, এর মধ্যে ভাল লাগছে না কি? তা ছাড়া ওখানেও তো তোর ভাল লাগছিল না।

—এখানেও লাগছে না। এমন একা একা থাকা যায়। মায়াকে আনলেও তো পারতে।

—রায়বাহাদুর হাসতে হাসতে বললেন, তারা সবাই আসবে মা, সবাই আসবে।

—সবাই আসবে। কবে?

—এই তোর বিয়ের দিনটা ঠিক হয়ে গেলেই।

মঞ্জুর মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো, বললে, ওঃ বিয়ে। বিয়ে কি না করলেই নয় বাবা?

রায়বাহাদুর সবিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন: কেন রে? এ বিয়েতে তোর তো কোন অমত নেই মা?

—কই, আমি কি তা বলেছি?

বাইরে মোটরের শব্দ পাওয়া গেল।

রায়বাহাদুর বললেন, বোধহয় ডাক্তার রায় এলেন। আমি এখনি আসছি, তুই ততক্ষণ আলাপ কর।

রায়বাহাদুর ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন। মঞ্জু ড্রেসিং টেবলের সামনে গিয়ে প্রসাধনে মন দিল। প্রসাধন শেষ করে চললো ড্রয়িং রুমে।

ডাক্তার রায়কে নামিয়ে দিয়ে স্নুজিত গাড়ি নিয়ে বাড়ীর বারেই অপেক্ষা করছিল। মনে নানা চিন্তার ঝড়। জীবনে অনেক অদ্ভুত অবস্থায় পড়েছে, কিন্তু এমন বেকায়দায় পড়েনি কখনও। নিরুপায় স্নুজিত চক্রবর্ত্তী গাড়ির ষ্টিয়ারিংএ মাথা রেখে ঘুমোবার ভাণ করে রইলো।

ডাক্তার রায় ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছিলেন।

মঞ্জু ঘরে ঢুকে বললে, নমস্কার। আর কোন নতুন surprise এনেছেন নাকি?

—surprise। না: surprise আর কোথায় হোলো। শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইছি।

—কষ্ট কিসের! এক হিসেবে আমাদের তো অবাকই করে দিয়েছিলেন। যা একটা আবিষ্কার দেখালেন!

—আর লজ্জা দেবেন না। আমারই বোকামী। স্নুজিত চক্রবর্ত্তী নামটা দেখেই আমি নেচে উঠেছি, ও নামে যে আরও পাঁচ হাজার লোক থাকতে পারে সে খেয়াল আমার হয়নি।

—কিন্তু হঠাৎ আপনার স্নুজিত চক্রবর্ত্তীকে খোঁজবার খেয়াল হোলো কেন? এ ধারণা আপনার হোলো কি কারণে যে তার খোঁজ পেলেই আমরা অবাক ও আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাব!

ডাক্তার রায় মঞ্জুর দিকে ভালো করে চাইলেন, তার চোখে চোখ রেখে বললে, সে ধারণাটা কি একেবারেই ভুল মিস্ চ্যাটার্জ্জী?

—নিশ্চয়ই ভুল। শুধু ভুল নয়, এ রকম ধারণা করা আপনার অন্যায়।

ডাক্তার রায় জবাব না দিয়ে মৃদু হাসলেন।

মঞ্জু বলতে লাগলো: স্নুজিত চক্রবর্ত্তী কে এমন একটা লোক, কে তিনি আমাদের যে তার জন্যে আমরা দিনরাত ভেবে মরছি ভাবছেন! তাঁকে খুঁজে পাওয়া না পাওয়ায় আমাদের কি আসে যায়!

ডাক্তার রায় বললেন, একটা সহজ কথা এবার সহজ ভাবে বলব

মিস চ্যাটার্জ্জী, রাগ করবেন না। মিথ্যে অভিমানের বশে নিজের মনকে ফাঁকি দিয়ে সাধ করে অসুখী হবেন না।

ডাক্তার রায়ের কথা শুনে মঞ্জু এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে রইলো, তারপর হঠাৎ যেন জ্বলে উঠলো আগুণের শিখার মত : তার মানে? আপনি কি বলতে চান? সুজিত চক্রবর্ত্তীর জন্যে আমি ভেবে মরছি, তাঁকে—তাঁকে আমি···ভালবেসেছি!

ডাক্তার রায় বললেন, সেটা কি এমন কিছু অন্যায় বা অসম্ভব! সুজিতবাবুকে ঈর্ষা করলেও তাঁর আকর্ষণ তো অস্বীকার করতে পারি না।

—আপনি কি সুজিতবাবুর জন্যেই আজ এখানে এসেছেন? মঞ্জু বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো : আপনার সঙ্গেই আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে জানতাম। সেটা যদি আপনার কাছে দায় বলেই মনে হয় তা হ'লে আর কারও কাঁধে আমায় নামাবার চেষ্টা না করে স্পষ্ট বললেই তো পারেন। সুজিতবাবুকে বদলী দেবার চেষ্টা না করেও ছাড়া পাবেন।

ডাক্তার রায়ও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যাক বাঁচলাম। কি খুসী যে আমায় করলেন মিস্ চ্যাটার্জ্জী তা বলতে পারি না।

—খুসী?

—খুসী নয়! আর আমাদের বিয়ের কোন বাধাই রইলো না। জানেন না সেই হতভাগা বাউণ্ডুলেটাকে আপনি ভালবাসেন ভেবে এই ক'দিন কি দুঃখটাই না পেয়েছি। যে কাঁটাটা রাতদিন মনের মধ্যে খচ খচ করছিল সেটা একেবারে······

রায়বাহাদুর এই দিকে আসছিলেন। দরজার বাহির থেকে কাঁটা কথাটা তাঁর কাণে গেল। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বললেন, কাঁটা? কার গলায় কাঁটা ফুটলো! ওরে এক গ্লাস জল, না, না একটা পাকা কলা···না, না, কি বলে···

তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চাইলেন।

ডাক্তার রায় হাসতে হাসতে বললেন, তার চেয়ে একটা পাঁজি চেয়ে আনতে বলুন।

—পাঁজি! পাঁজি দেখে কাঁটা তোলাটা .....

—না, না, কাঁটা তুলতে নয় রায়বাহাদুর, পাঁজি দরকার বিয়ের তারিখ ঠিক করতে।

রায়বাহাদুর প্রথমে যেন নিজের কাণটাকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। ডাক্তার নিজে পাঁজি চাইছে......তা হ'লে...

ব্যাপারটা বোধগম্য হ'তে তিনি আহ্লাদে অস্থির হয়ে পড়লেন: ওঃ হো, বিয়ের তারিখ! তারিখ তা হ'লে এবার ঠিক করা যেতে পারে! দেরী করবার কোন দরকার নেই তা হ'লে।

'—কিছু মাত্র না।' বলে ডাক্তার রায় মঞ্জুর দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর বললেন, শুধু আমার একটা অনুরোধ আছে মিস্ চ্যাটার্জী। আপনি আমায় রংপুর দেখাতে চেয়েছিলেন—কাল সন্ধ্যায় আমি আপনাকে কলকাতায় ঘুরিয়ে সেই ঋণ একটু শোধ করতে চাই—

রংপুরের পূর্ণিমা থিয়েটারে অভিনয় করতে নেমে ডাক্তার রায় যথেষ্ট ভড়কে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কলকাতায় নিজের অভিনয় শক্তি দেখে তিনি নিজেই মনে মনে মুগ্ধ হ'লেন।

রায়বাহাদুর তাঁর প্রস্তাবে আপত্তির কোন কারণ দেখতে পেলেন না, উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, বেশ তো, বেশ তো! সে আর এমন কি কথা! আজই তো যেতে পারে মঞ্জু।

—না, আজ নয় রায় বাহাদুর! এতখানি সৌভাগ্যের জন্যে আজ ঠিক প্রস্তুত নই। তা ছাড়া একেবারে নতুন ড্রাইভার, তাকে দু একদিন পরীক্ষা না করে মিস্ চ্যাটার্জীকে নিয়ে বার হ'তে সাহস হয় না।

—আপনি আবার নতুন ড্রাইভার রাখলেন নাকি? রায় বাহাদুর প্রশ্ন করলেন।

ডাক্তার রায় হাসতে হাসতে বললেন, একেবারে নতুন। তবে

আমার ভরসা আছে দু একদিনের মধ্যে সে পাকা হাতের পরিচয় দিতে পারবে। রীতিমত একটা আবিষ্কার বলা যায়।

মঞ্জুর দিকে চেয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন বিকালে বাড়ী থেকে বা'র হ'বার সময় ডাক্তার রায় একটা বেতার বাস্কেট দিলেন সুজিতের হাতে, বললেন, যত্ন করে রাখবেন। যখন চাইবো তখন এটা আমার হাতে দেবেন। বুঝলেন ?

সুজিত ঘাড় নাড়লো।

রায়বাহাদুরের বাড়ীতে এসে মঞ্জুকে খবর দেবার জন্যে ডাক্তার রায় ভিতরে চলে গেলেন। সুজিত কৌতুহলী হয়ে বেতের বাস্কেটটা খুলে দেখলো—ভিতরে একটা মদের বোতল, একটা গ্লাস এবং গোটা দুই শোডার বোতল। ডাক্তার রায় মদ খান! সুজিতের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইলো না। এতদিন মানুষ চেনে বলে তার একটা অহঙ্কার ছিল, কিন্তু এখন মনে হ'তে লাগলো, মুখ দেখে মানুষ যাচাই করার মত ভুল আর নেই!

সুজিত তখনও অবাক হয়ে মদের বোতলটার দিকে চেয়ে ছিল, ডাক্তার রায় বেরিয়ে এলেন।

সুজিত বললে, এ আবার কি ব্যাপার মশাই! আপনার এসব রোগ আছে বলে তো জানতাম না!

ডাক্তার রায় দিব্য সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিলেন: কিছুদিন চাকরী করলে ক্রমশঃ সবই জানতে পারবেন। কিন্তু মনিবের সমালোচনাটা কি তার সামনে করা উচিৎ! ডিসিপ্লিন, ডিসিপ্লিন মিঃ চক্রবর্ত্তী—ভুলবেন না আমি ডিসিপ্লিন চাই।

সুজিত বললে, ডিসিপ্লিন আমি ভুলিনি, ছদ্মবেশই তার প্রমাণ। কিন্তু মিস চ্যাটার্জ্জী এগুলো দেখলে কি ভাববেন!

ডাক্তার রায়ঃ তার চেয়ে আপনার এমন সহজ সতেজ গলা শুনে

তিনি কি ভাববেন তাই ভাবুন। আপনার চাকরীর qualification-এর মধ্যে তোতলামীটাও একটা গুণ, এটা আপনার ভোলা উচিৎ নয়।

সুজিত মনে মনে ডাক্তার রায়ের ওপর রীতিমত অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। এতক্ষণ আশা ছিল যে মদের বোতল প্রভৃতির একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ হয়তো তিনি দেবেন, কিন্তু তার নির্লজ্জ কথাগুলোর পর সে আশাও রইল না। সুজিত বেশ ক্রুদ্ধভাবে বলে উঠলো, দেখুন, আপনার কাছে চাকরী নিয়েছি বলে আপনি যদি মনে করে থাকেন—

কথাটা শেষ করা হোলো না; দেখা গেল মঞ্জু বাড়ী থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে আসছে। ডাক্তার রায় সেদিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এমন পরিষ্কার গলা শুনলে মিস্ মঞ্জু আপনাকে চিনে ফেলতে পারেন, অবশ্য তাই যদি আপনার মতলব হয়—

মঞ্জু এসে পড়লো গাড়ির কাছে।

সুজিত তাড়াতাড়ি বাস্কেটটা সরিয়ে ফেলে বললে : আ—আমার তা—তাই ম—মতলব। আমার য—যদি তা—তা—

ডাক্তার রায় বললেন, হ্যাঁ, তারপর—?

মঞ্জু কিছু বুঝতে না পেরে বললে, ব্যাপার কি ডাক্তার রায়?

— কিছু না। এই আমার ড্রাইভারকে একটু তাতাচ্ছিলাম।

—তাতাচ্ছিলেন! মঞ্জু আশ্চর্য্য হয়ে চাইলো ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার রায় বললেন, হ্যাঁ মোটরের মতই আমার ড্রাইভারকে মাঝে মাঝে তাতিয়ে নিতে হয়। নইলে চলে না! নিন্ উঠে পড়ুন, আর দেরী করবেন না।

মঞ্জু গাড়িতে উঠলো, ডাক্তার রায় তার পাশে গিয়ে বসলেন।

সুজিত গম্ভীর মুখে গাড়িতে ষ্টার্ট দিল।

সন্ধ্যা হয়েছে। ডাক্তার রায়ের গাড়ি এসে থামলো লেকের একটা জন বিরল অংশে। সুজিত গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দিল। মঞ্জুকে নিয়ে ডাক্তার রায় নামলেন। মঞ্জু বললে, সহর দেখাতে বেরিয়ে এখানে নামলেন যে বড় ?

—সহর দেখানটা একটা ছল। বলে ডাক্তার রায় সুজিতের দিকে চেয়ে হাসলেন। সুজিত যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে নিজের সীটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মঞ্জু যেতে যেতে বললে, কেন বলুন তো, হঠাৎ এমন খেয়াল ?

ডাক্তার রায় মঞ্জুর একেবারে কাছ ঘেঁসে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার হাত ধরে ফেলে বললেন, খেয়াল তো হঠাৎই হয় মিস্ চ্যাটার্জ্জী। তা ছাড়া এমন কিছু অন্যায় খেয়াল তো নয়, দু'দিন বাদে যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার সঙ্গে এই নির্জ্জনে একটু হাত ধরাধরি করে চলবার সাধ কার না হয় !

সামনেই একটা বেঞ্চ পাওয়া গেল। মঞ্জুকে এক রকম জোর করেই তার ওপর বসিয়ে দিলেন। দূর থেকে সুজিত জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ওদের দুজনকে দেখতে লাগলো।

মঞ্জু বেঞ্চের উপর বসে বললে, আপনার মধ্যে এত কবিত্ব ছিল ডাক্তার রায় !

ডাক্তার রায় মঞ্জুর পাশটিতে বসতে বসতে বললেন, আমার ভেতর কত কি যে ছিল তা আবিষ্কার করে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি মিস চ্যাটার্জ্জী। অবশ্য এসবই আপনার গুণ, চকমকি না ঠুকলে এ মরা কাঠে আগুন জ্বলতো না।

ডাক্তার রায়ের আজকের ব্যবহারে মঞ্জুর রীতিমত খট্‌কা

লাগছিল, এই শান্ত শিষ্ট মানুষটির এই আকস্মিক ছেলেমানুষীর সঠিক একটা কারণ হাজার চেষ্টা করেও সে খুঁজে পাচ্ছিল না। একটু চুপ করে থেকে সে বললে, আপনি কি আজ এখানে এই সব কথাই শোনাবেন ?

শুধু এই সব ? ডাক্তার রায় তার গাড়িটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে কণ্ঠস্বর আর এক পর্দ্দা চড়িয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন : এর চেয়ে ভালো ভালো অজস্র কথা আমি আপনাকে শোনাব, একটু ধৈর্য্য ধরুন। ড্রাইভার, এই ড্রাইভার—

ডাক্তার রায়ের ডাক শুনে সুজিত বেঞ্চের দিকে এগিয়ে এলো—মুখে চোখে স্পষ্ট বিরক্তি।

মঞ্জু ড্রাইভারকে আসতে দেখে বললে, একটু সরে বসুন ডাক্তার রায়, আপনার ড্রাইভার আসছে, কি ভাববে—

ডাক্তার রায় সরে বসবার আগেই সুজিত এসে পড়লো। ডাক্তার রায় কিছুমাত্র বিব্রত বোধ না করে মঞ্জুর দিকে চেয়ে রইলেন। যেন সুজিতকে দেখতেই পায় নি। রাগে সুজিতের কাণের ডগা পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠেছিল, ইচ্ছে করছিল এক থাপ্পর মেরে বেরসিক ডাক্তারকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয় ; কিন্তু কিছুই সে করলো না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে মনিবের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো। ডাক্তার রায় কিন্তু ড্রাইভারকে তখনই কোন আদেশ দেওয়া দরকার মনে করলেন না, বরং তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, হুঁঃ, ড্রাইভার আবার একটা মানুষ, তার আবার মনে করা !...... কিন্তু তোমায় মিস্ চ্যাটার্জ্জী বলে আর কত ডাকবো বল তো ? এবার থেকে শুধু মঞ্জু বলে ডাকবো কেমন ?

বলতে বলতে মঞ্জুর একটা হাত তিনি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির ফলে মঞ্জু রীতিমত বিরক্তি বোধ করছিল, হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে সে আড়ষ্ট ভাবে বললে, বেশ তাই বলবেন, কিন্তু—

সুজিত কি করবে স্থির করতে না পেরে হঠাৎ কেসে ডাক্তার রায়ের

দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলো। ডাক্তার রায় এতক্ষণে ড্রাইভারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার সুযোগ পেলেন যেন, বললেন: ওঃ, এই যে ড্রাইভার! গাড়ি থেকে বাস্কেটটা নিয়ে এসো দেখি।

এবার সত্যিই সুজিতের গায়ের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে গেল। বলে কি লোকটা? ভদ্র মহিলার সামনে মদের বোতল বা'র করবে নাকি?

ডাক্তার রায় আবার বললেন, শুনতে পাচ্ছ না, আমার বাস্কেটটা নিয়ে এসো।

সুজিত বললে, দেখুন, এখনও আমি……

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সুজিত, ডাক্তার রায় তাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সে প্রথমতঃ ড্রাইভার, দ্বিতীয়তঃ তোৎলা।

সুজিতের কিন্তু তখন সে কথা মনে নেই, সে বললে, আপনাকে আমি সা—

তার বলার উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তার রায় বললেন, সা রে গা মা সাধতে বলিনি, বাস্কেটটা আনতে বলেছি। চাকর-বাকরদের যদি একটু ডিসিপ্লিন জ্ঞান থাকে!

ক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত সুজিত ফিরে গেল মোটরের দিকে—বাস্কেটটা আনবার জন্যে।

ডাক্তার রায় মনে মনে খুশী হয়ে উঠছিলেন। সুজিত চটেছে! অর্থাৎ ওষুধ ধরতে সুরু করছে। দেখা যাক, আর কতক্ষণ সে আত্মসংযমের মহিমা প্রচার করতে পারে।

মঞ্জুর দিকে ফিরে ডাক্তার রায় বললেন, তারপর কি বলছিলাম তখন?

মঞ্জু বিরক্ত ভাবে বললে, আমি মুখস্থ করে রাখিনি, কিন্তু এখান থেকে উঠলে হয় না?

—সে কি। এরই মধ্যে উঠবে কি। এখনও তো চাঁদই উঠে নি।

—আপনি কি চাঁদ দেখে এখান থেকে উঠবেন না কি?

—তাইত ওঠা উচিত। সেই যে কবি কালিদাস বলে গেছেন—

—কি বলেছেন কবি কালিদাস?

—সেই যে—ঘরে যদি থাক ত চাঁদ না উঠলে বাইরে যেও না, বাইরে যদি থাক তো চাঁদ না দেখে ঘরে ফিরো না।

চাঁদ সম্বন্ধে চটকদার কোন কথা শোনবার ধৈর্য্য মঞ্জুর ছিল না, কৃষ্ণ পক্ষের রাত—চাঁদ উঠতে এখনও অনেক দেরী, এই ভেবেই সে অস্থির হয়ে উঠছিল; ডাক্তার রায়ের কথা শেষ হ'তেই সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: কালিদাস ও-রকম কথা কখনও বলেন নি।

—বলেন নি? না বলে থাকলে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন, বলা উচিৎ ছিল।

ইতিমধ্যে সুজিত বাস্কেটটা নিয়ে ফিরে এসেছিল, ওটা সে বেঞ্চের উপর নামিয়ে রেখে একটু সরে দাঁড়াল। ডাক্তার রায় বাস্কেট থেকে মদের বোতল আর গ্লাস বার করলেন, তারপর সোডার বোতলটা খুলতে খুলতে মঞ্জুর দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, তা ছাড়া···এমন জায়গা ছেড়ে তোমার বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করে মঞ্জু? মনে করো এ আমাদের অভিনয় রাত্রি—

বলতে বলতে ডাক্তার রায় সুজিতের দিকে একটা চোরা চাহনি নিক্ষেপ করলেন; সুজিত বিরক্ত হয়ে আরও কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

ডাক্তার রায় এবার কণ্ঠস্বরে আরও একটু উচ্ছ্বাস ঢেলে বলতে লাগলেন, এই নির্জ্জন প্রান্তরে শুধু তুমি আর আমি·······

মঞ্জু আর সহ্য করতে পারলো না, উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, আপনি ক্রমশঃ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন ডাক্তার রায়।

'বাড়াবাড়ি!'—ডাক্তার রায় বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ

গ্লাসে ঢেলে সোডা মিশিয়ে চুমুক দিলেন, তারপর আবার বলতে সুরু করলেন : তুমি একে বাড়াবাড়ি বল মঞ্জু! আমার ভালবাসার উচ্ছ্বাসকে তুমি এমনি করে অপমান করছো! তুমি এত নিষ্ঠুর!

ডাক্তার রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার মদের গ্লাসে চুমুক দিলেন। নিজের অদ্ভুত অভিনয়-দক্ষতায় তিনি হাসবেন না কাঁদবেন, ঠিক বুঝতে পারছিলেন না।

মঞ্জু বললে, আপনি ভদ্রলোক বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ....এটা কি হচ্ছে আপনার?

—এটা? ডাক্তার রায়ের কথাগুলো এবার একটু জড়িত হয়ে এলো—কেন, একটু drink করছি, কালিদাস বলেছেন, তুমি আমার পাশে আর হাতে এই সুরার পাত্র—

—Hang your Kalidas! এই জন্যে আমায় এখানে এনেছেন, এইভাবে আমায় অপমান করবার জন্যে?

—কি বলছ মঞ্জু? একটু drink করেছি বলে তুমি অপমান বোধ করছ? আমাদের আমেরিকায় necking party-তে drink না করলে মেয়েরা অপমান বোধ করতো—

—আমি আপনাদের আমেরিকার necking party-র মেয়ে নই। আমায় বাড়ী পৌঁছে দিন, আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না।

ডাক্তার রায় গ্লাসে আরও খানিকটা মদ ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন; তারপর মঞ্জুর হাতটা ধরে ফেলে বললেন, তুমি—তুমি রাগ করছ dearie! লক্ষ্মীটি, রাগ করো না—সারা জীবন যার সঙ্গে ঘর কর্ত্তে হবে তার ওপর এত তুচ্ছ কারণে রাগ করতে আছে!

সুজিত অদূরে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছিল; তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, বুনো বাঘকে কে যেন খাঁচায় আটকে রেখেছে!

ডাক্তার রায়ের কথার জবাবে মঞ্জু বললে, আপনার সঙ্গে সারা জীবন ঘর করতে হবে? আপনাকে এতদিন চিনতে পারি নি তাই—এখন বলছি, আমায় ছেড়ে দিন।

মঞ্জু সজোরে তার হাতটা ডাক্তার রায়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল।

ডাক্তার রায় তাকে ধরবার জন্যে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন, তাকি হয় dearie। অভিসার লগ্ন কি বৃথা যাবে?

মঞ্জুর হাতটা তিনি আবার চেপে ধরলেন।

মঞ্জু বলতে লাগলো: ছাড়ুন, আমায় ছেড়ে দিন—আমায় ছেড়ে দিন।···

সুজিতের পক্ষে আর নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করা সম্ভব হোলো না। মঞ্জু, তার মঞ্জু—এমনি ভাবে একটা মাতালের হাতে লাঞ্ছিত হবে, সে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে? সে ফিলে এলো ওদের কাছে।

ডাক্তার রায় ধমকে উঠলেন, তুম্—তুম্‌কো কোন্ বোলায়া? যাও—

সুজিত বললে, না।

—না! এতদূর স্পর্দ্ধা?

—আপনাকে আমি ভাল কথায়—

—ভাল কথায়? what the devil you mean? তুমি ভুল করছো, তুমি একটা ড্রাইভার। গেট্ আউট—

সুজিত মারবার জন্যে ঘুসি তুলেছিল, কিন্তু পারলো না, ভদ্রতা এসে বাধা দিল। রাগে, দুঃখে, অপমানে মাথা হেঁট করে সরে গেল।

ডাক্তার রায় বললেন, কিছু মনে করো না মঞ্জু, বেয়াদপ ড্রাইভারটাকে আমি কালই তাড়িয়ে দেব।

তিনি আবার মঞ্জুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, মঞ্জু তাঁর কাছ থেকে সরে এসে ডাকলো, ড্রাইভার, ড্রাইভার—

সুজিত থমকে দাঁড়াল।

মঞ্জু তার কাছে গিয়ে বললে,তুমি—তুমি আমায় একটু দয়া করে াড়ী পৌঁছে দাও। আমি তোমায় যা চাও বখশিস্ দেব।

ডাক্তার রায় নাটকীয় ভঙ্গীতে হাততালি দিয়ে উঠলেন: বাঃ মৎকার! শেষে ওই বেয়াদপ ড্রাইভারটা তোমার বিশ্বাসের পাত্র হ'লো মঞ্জু? কিন্তু তুমি ভুলে যেও না যে ও আমার ড্রাইভার—

মঞ্জু বললে, আপনার ড্রাইভার হ'তে পারে, কিন্তু আপনার মত মাতাল, বদমায়েস, ইতর নয়। ওর ভেতর আপনার চেয়ে হয়ত মনুষ্যত্ব বেশী আছে—

ডাক্তার রায় মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এমনি একটি মুহূর্ত্তের জন্যই তো তাঁর এত আয়োজন, এত চেষ্টা! চরম অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দেবার সময়ও তো এই।

মঞ্জুর দিকে চেয়ে তিনি বললেন, তাই নাকি! কিন্তু তবু ওর সঙ্গে তোমায় আমি যেতে দিতে পারি না। তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।

ডাক্তার রায় এবার হাত বাড়িয়ে মঞ্জুকে প্রায় নিজের বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলেন।

সুজিত স্থান, কাল, পাত্র ভুলে গেল। টান মেরে খুলে ফেললো মুখের গোঁফ-দাড়ি আর মাথার পাগড়িটা। তারপর গর্জ্জে উঠলো: Lay off your had!

ডাক্তার রায় চমকে ওঠার ভঙ্গী করে বললেন, ও বাবা! এতো ড্রাইভারের বুলি নয়। এ যে অন্য চেহারা—

বেঞ্চ থেকে মদের বোতলটা তুলে নিয়ে তিনি এক ঢোক খেয়ে ফেললেন।

সুজিত তাঁর সামনে এসে বললে, হ্যাঁ, বাধ্য হয়েই এই চেহারা দেখাতে হোলো।

ডাক্তার রায় বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, আরে এ যে

বেকার বাউণ্ডুলে সুজিত চক্রবর্ত্তী দেখছি! একেবারে নাটকীয় আবির্ভাব!

মঞ্জু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল, সুজিতের মুখের দিক চেয়ে শুধু বললে, তুমি!

সুজিত হাসতে হাসতে বললে, তুমি কি ভেবেছিলে?

মঞ্জু বললে, ভেবেছিলাম আমায় হয় তো ভুল বুঝেছ। হয় তো আর আসবে না—

সুজিত মঞ্জুর হাত ধরে বললে, সেই ভুলই আর একটু হলে করতে যাচ্ছিলাম।

ডাক্তার রায় আবার হাত তালি দিতে দিতে মত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন: বাঃ! চমৎকার মিলন দৃশ্য। কিন্তু এ দৃশ্যে আমার স্থানটা কোথায় জানতে পারি— ?

—আপনার স্থান আপাতঃ এইখানেই এই মাঠের মাঝখানে। চল মঞ্জু—

মঞ্জুকে নিয়ে সুজিত গাড়ির দিকে চললো।

ডাক্তার রায় তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখে হাসি।

মঞ্জুকে মোটরে তুলে সুজিত গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। ডাক্তার রায় স্খলিত পায়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে গাড়িতে ওঠবার চেষ্টা করলেন। সুজিত তাঁকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিয়ে বললে, তা হয় না ডাক্তার রায়। এ গাড়িতে দুজনের বেশী ঠাঁই নেই।

...কিন্তু গাড়িটা কি আমার নয়? ডাক্তার রায় যেন শেষ চেষ্টা করলেন।

সুজিত গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বললে, ভয় নেই, গাড়ি যথাসময়ে ফেরৎ পাবেন।

অন্ধকার চারিদিকে গাঢ় হয়ে এসেছিল, তার মধ্যে গাড়িটা হারিয়ে যেতে দেরী হ'লো না।

ডাক্তার রায় মদের বোতলটা ফেলে দিয়ে হাঁটতে সুরু করলেন।

হঠাৎ বড় ক্লান্ত, বড় একা মনে হচ্ছিল। কিন্তু জীবনে এত ভাল অভিনয় তিনি আর কখনও করেন নি। রংপুরের পূর্ণিমা থিয়েটারের ম্যানেজার ভাগ্যে জোর করে তাঁকে ষ্টেজে ঠেলে দিয়েছিল, নইলে তাঁর এত বড় সুপ্ত প্রতিভার কথা তিনি বোধহয় জানতেও পারতেন না। এই ভেবে তিনি খুসী হবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ মনে হোলো চোখে কি পড়েছে। জল আসবে নাকি?

হাসবার চেষ্টা করলেন তিনি। দুটি লোক ভুল করে উল্টো পথে চলে যাচ্ছিল, তাদের তিনি যথাস্থানে এনে মিলিয়ে দিয়েছেন। আজকের স্বেচ্ছাকৃত ট্রাজেডির মধ্যে এইটুকুই তো যথেষ্ট সান্ত্বনা।

ডাক্তার রায় জোর করে পা দুটোকে টেনে নিয়ে চললেন।